দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

রঙে রঙে সংহতির
জাতীয় উৎসব
— পৃঃ ২৩

৭৭ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা।। ১০ মার্চ, ২০২৫।। ২৫ ফাল্গুন, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ২৫ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

১০ মার্চ - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

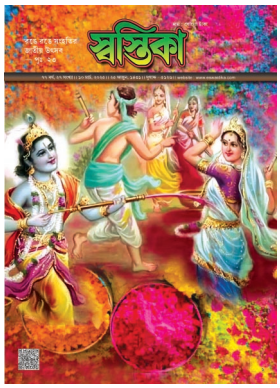

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

রাজনীতির পিছনের দরজায় হিন্দুত্ববাদী সেজে মমতা আর ঈশ্বরবিশ্বাসী সিপিএম : 'মন্থরা'

☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

রাজ্যে এত মৃত্যু কেন দিদি? ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

বনফুল এবং তার ছোটো ভাই ☐ সর্বজিৎ মুখোপাধ্যায় ☐ ৮

বামপন্থী, অতিবামপন্থী ও রাজ্যের শাসক দলের সংযোগেই ছাত্র-সমাজ বিপথে পরিচালিত ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল হতে হিন্দু নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়ার এখন সময়

☐ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ☐ ১১

ব্রাহ্মণ পরিচয়ের আড়ালে মমতা ব্যানার্জি নিজের অপরাধী চরিত্রটি লুকোনোর চেষ্টা করছেন

☐ সাধন কুমার পাল ☐ ১৩

বৃন্দা কারাতের হিন্দু ব্যাখ্যান ☐ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ☐ ১৫

বিশ্বমানবের কল্যাণে মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির আন্দোলন

☐ প্রদীপ মারিক ☐ ১৭

গল্প : বইমেলার আড়ালে ☐ অজয় ভট্টাচার্য ☐ ১৯

ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

☐ সত্যানন্দ গুহ ☐ ২১

রঙে রঙে সংহতির জাতীয় উৎসব

☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ২৩

রানি রাসমণি : পাশ্চাত্য শিক্ষা ও হিন্দুধর্ম

☐ পিনাকী দত্ত ☐ ৩১

সত্য ও সুন্দরের মিলনবিন্দু শিব ☐ রতন চক্রবর্তী ☐ ৩৩

দোলে কল্যাণী ঘোষপাড়ায় সতীমায়ের মেলা

☐ সপ্তর্ষি ঘোষ ☐ ৩৪

গল্প : ফাগুনের মেঘ আকাশ ☐ মৌ চৌধুরী ☐ ৩৫

গল্প : এক শালিক, দুই শালিক ☐ নিখিল চিত্রকর ☐ ৩৭

গল্প : খুঁটি ☐ দেবসাদ কুণ্ডু ☐ ৪৩

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব বঙ্গভূমির পরমতম আশীর্বাদ

☐ গোপাল চক্রবর্তী ☐ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ :

☐ সমাবেশ সমাচার : ২৭-৩০ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

প্রকাশিত হবে
১৭ মার্চ
২০২৫

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৭ মার্চ
২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী রাজনীতি

ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি ভারতের প্রাণ। ভোট-ভিখারি রাজনৈতিক দলগুলি ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বারবার আঘাত করছে। সম্প্রতি প্রয়াগরাজের পূর্ণমহাকুম্ভ মেলাকে নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েনি এইসব ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী দলগুলো। যেনতেন প্রকারে কোটি কোটি হিন্দুর আস্থা ও ভাবাবেগকে কটাক্ষ করাই যেন ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় ওইসব দল তথা ব্যক্তির হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির বিরোধিতার স্বরূপ উন্মোচন করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

With Best Compliments
From-

A
Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রঙের উৎসব

ভারতীয় সংস্কৃতির অভিন্ন অঙ্গ হইল উৎসব। উৎসবে নিজেকে বিলীন করিয়া অনুভব করা যায় ভারতবর্ষের আত্মাকে। ভারতবর্ষের বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত হইল ভারতবর্ষের ইতিহাস। ইহার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে ভারতবর্ষের জীবনকথা। এই জীবনকথারই একটি হইল উৎসব। দোল উৎসব রাজ্যভেদে দোলযাত্রা, হোলি, হোরি, রংপঞ্চমী, ধুলোতি, হোল্লা মহল্লা, শিগমো, মঞ্জলকুলি ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হইয়াছে। শীতের অবসানে, বসন্তঋতুর আগমনে এই উৎসবে মাতিয়া উঠে ভারতবর্ষের মানুষ। শুধু ভারতবর্ষে নহে, এই উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশ এবং ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী প্রবাসী হিন্দুরাও মাতিয়া উঠে এই উৎসবে। ইহা একটি প্রাচীন ভারতীয় উৎসব। নারদপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণের ন্যায় গ্রন্থগুলিতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। দেশভেদে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও ইহা রঙের উৎসব। একের সহিত বহুর মিলনই হইল এই উৎসবের মূলকথা। রঙের স্পর্শে সবাইকে আপন করিয়া লওয়াই ইহার মূল ভাবনা। সর্বপ্রকারের বৈষম্য ভুলিয়া, মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া বিশ্বজনীন আনন্দে মাতিয়া উঠিবার উৎসব। দেশ জুড়িয়া সমস্ত বিভেদ ভুলিয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিবার এইহেন উৎসবের দৃষ্টান্ত বিশ্বের আর কোথাও রহিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। বঙ্গজীবনে এই উৎসবকে দোল নামে অভিহিত করা হইলেও উত্তর ও মধ্য ভারতীয় রাজ্যগুলিতে হোলি বা হোরি বলা হইয়া থাকে। হোলি উৎসবের কেন্দ্রে রহিয়াছেন ভগবান বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার নৃসিংহদেব, ভক্ত প্রহ্লাদ এবং দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু-ভগিনী হোলিকার আখ্যান। ভক্ত প্রহ্লাদকে অগ্নিদগ্ধ করিতে আসিয়া হোলিকা নিজেই দগ্ধ হইয়াছিল। হোলিকার মৃত্যুতে বিষ্ণুভক্তগণ সেইদিন হোলিকাদহনের ভস্ম পরস্পরকে মাখাইয়া আনন্দে উৎসবে মাতিয়াছিলেন। সেই অশুভ শক্তির বিনাশের স্মরণেই ফাল্গুনীপূর্ণিমার প্রদোষে বহ্ন্যুৎসব এই উৎসবের অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গীয় সমাজে ইহাকে নেড়া বা মেড়াপোড়া বলা হইয়া থাকে। আসলে ইহা একপ্রকার পরিবেশের পরিষ্করণ প্রক্রিয়া বলা যাইতে পারে। ইহাতে সংবৎসরের আবর্জনা পুড়িয়া পরিবেশ স্বচ্ছ হইয়া ওঠে। ইহার সহিত আর এক পৌরাণিক কাহিনি ধুন্ধিবধেরও অনুষঙ্গ রহিয়াছে। প্রকৃত অর্থে ইহা অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটাইয়া শুভশক্তির জয় ঘোষণার উৎসব।

বঙ্গীয় জীবনে এই উৎসবকে দোল নামেই অধিক অভিহিত করা হইয়া থাকে। ইহার কেন্দ্রে রহিয়াছেন রাধা-কৃষ্ণ এবং তাঁহাদিগের দোলযাত্রা। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বত ও ঐশ্বরিক প্রেমের উদ্‌যাপন এই উৎসব। ফাল্গুনীপূর্ণিমায় বৃন্দাবনের যমুনাপুলিনের কদম্বকাননে গোপবালক ও বালিকাগণ রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় বসাইয়া গান গাহিতে গাহিতে রঙে রঙে রঞ্জিত করিয়া নিজেরাও রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। আবার, কংসের অনুচর কেশী দৈত্যকে বালক কৃষ্ণ বধ করিয়া তাহার রক্তে নিজেরা রঞ্জিত হইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল। তাহারই স্মরণে রঙের এই উৎসবের নাম দোল বা হোলি হইয়াছে মনে করা হইয়া থাকে। বঙ্গীয় জীবনে হোলি বা দোল উৎসব এক অন্য মাত্রা পাইয়াছে দোলপূর্ণিমা তিথিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে। মনে করা হইয়া থাকে, রাধা-কৃষ্ণই একত্রে রূপ পরিগ্রহ করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হইয়াছেন। তাই বঙ্গজীবনে রাধাকৃষ্ণ ও মহাপ্রভুকে লইয়াই এই উৎসবের উদ্‌যাপন। চৈতন্য মহাপ্রভুর স্মরণে হরিনাম সংকীর্তনে বঙ্গভূমিতে এই দিন প্লাবন বহিয়া যায়। হিন্দুজাতির ত্রাতা, উদ্ধারকর্তা হইলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁহার আবির্ভাব না ঘটিলে বঙ্গভূমিতে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইত তাহা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে মুহ্যমান হিন্দুজাতিকে তিনি নবচেতনায় জাগ্রত করিয়াছিলেন। ইহার জন্যই মধ্যযুগের ষোড়শ শতকের কালখণ্ডকে হিন্দুজাতির নবজাগরণের কাল বলা হইয়া থাকে। স্বধর্ম ও স্বজাতি রক্ষায় তিনি সিংহগর্জনে দুষ্টের দমন করিয়া স্বধর্ম পালনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। বৈদেশিক মতাদর্শ একশ্রেণীর বাঙ্গালিকে কিছুকাল মহাপ্রভুর প্রভাব হইতে দূরে রাখিয়াছিল। অদ্যাবধি তাহাদের সেই ভ্রান্তি বিদূরিত হয় নাই। দোল উৎসবে বাঙ্গালিকে তাহার জড়তা কাটাইয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আরও নিবিড়ভাবে স্মরণ করিয়া বঙ্গভূমির কালিমা বিমোচনে সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। বাঙ্গালির দোল উৎসব মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করিয়াই। আর তিনি ছিলেন অপশাসন ও দুষ্টের বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিগ্রহ ।

সুভাষিতম্

ব্যসনে মিত্রপরীক্ষা শূরপরীক্ষা রণাঙ্গণে।
বিনয়ে ভৃত্যপরীক্ষা দানপরীক্ষা চ দুর্ভিক্ষে।। (হিতোপদেশ)

বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা হয়, রণাঙ্গণে বীরের পরীক্ষা হয়। ভৃত্যের পরীক্ষা বিনয়ে হয় এবং দুর্ভিক্ষের সময় দানের পরীক্ষা হয়।

রাজনীতির পিছনের দরজায় ‘হিন্দুত্ববাদী সেজে মমতা আর ঈশ্বরবিশ্বাসী সিপিএম’

‘মন্থরা’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

কাঁঠালের আমসত্ত্ব হয় না। হিন্দু ভোটার-প্রেমী মমতা আর ঈশ্বরবিশ্বাসী সিপিএম হয় না। মমতার পছন্দ রাজনীতির পিছনের রাস্তা। তৃণমূল তৈরি থেকে সিপিএমের সঙ্গে গোপন সমঝোতা। রেলমন্ত্রী থাকার সময় রেল ভবনের পিছন দরজা দিয়ে হেঁটে মমতা ব্যানার্জি ঢুকতেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে চার্জশিট হয়েছে। ফাঁসির মঞ্চ থেকে এবার হেঁটে জেলে ঢুকবেন। দড়ি পড়লে কী হবে বলেননি, গলা কাটলে মমতা ব্যানার্জির নাম বেরোবে বলেছেন। একে বলে ৩৮ বছরের বালক বুদ্ধি! মমতার নতুন বই ‘দিদির কীর্তি’-র নাম হয়েছে ‘দিদির কুকীর্তি’। বিজেপির এক প্রবীণ নেতা ‘আমার দেশ আমার জীবন— মাই কান্ট্রি মাই লাইফ’ বইয়ে নিজের প্রশংসা করেছিলেন বলে মিথ্যা অভিযোগে একদা মুখর হয় বিদেশি বামেরা।

ঠেলায় না পড়েও বেড়াল গাছে ওঠে। মমতা ব্যানার্জি নিজেকে হিন্দু নারী হিসেবে জাহির করছেন আর বিদেশি সিপিএম জাহির করেছে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অচ্ছুত নন। মমতা শাসক আর সিপিএম ভোট শূন্য। উভয়ের হারাবার কিছু নেই। তবু কেন কপট হিন্দু সাজার চেষ্টা? ষাটের দশকে এক অর্বাচীন কমিউনিস্ট রবীন্দ্রনাথকে অপমান করে দলের ভিতর চটি জুতো খেয়েছিল। এ দেশের কমিউনিস্টদের ইতিহাস হিস্টরি অব উইথড্রয়াল। মলাটের নীচে ওলটানো ইতিহাস। শোধরাতেই ১০০ বছর পার হয়ে গিয়েছে। তারা নেতাজীকে নিকৃষ্ট ভাবে অপমান করা থেকে শুরু করে শ্রীরামকৃষ্ণের শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে কটাক্ষ করত। ঘোড়া হাসবে শুনে যে উভয়কে তারা এখন শ্রদ্ধা করে। এটা লজ্জার যে, ভোট বাজারে টিকে থাকতে মমতা ব্যানার্জি তাদের দোসর করেছে। মমতা হিন্দু সাজছে আর বিদেশি বামরা ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ হতে চাইছে। এ তঞ্চকতা ছাড়া কিছু নয়। গাছের আগা কেটে গোড়ায় জল দেওয়ার চেষ্টা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক শোভনলাল দত্তগুপ্ত তাঁর ‘ভুল হয়ে গেছে বিলকুল’ শীর্ষক লেখায় দেখিয়েছিলেন বামেরা ভারত মনীষাকে তাচ্ছিল্য করে কীভাবে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারে। তৃণমূল আর তার রাজনৈতিক লেজুড় সিপিএম হিন্দুত্বের গাছে উঠতে কপট বাক্য বলতে শুরু করেছে। অনেকদিন আগেই তারা গাছটি পুড়িয়ে দেয়।

বিজেপি রাজ্যের ৪০ শতাংশ হিন্দু ভোটারের ঐক্যকে সজীব রেখেছে। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী সঠিকভাবে নিজেকে হিন্দুদের নেতা বলেছেন। গত লোকসভা ভোটের নিরিখে ৯২টি বিধানসভা আসনে এগিয়ে বিজেপি। সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে প্রয়োজন তার অর্ধেকের কিছু বেশি আসন। রাজ্যে মমতা বিরোধী ভোট মোট ৫৫ শতাংশ। বিজেপি বিরোধী প্রায় ৬২ শতাংশ। বাম-কংগ্রেসের বিরোধী ৮৮ শতাংশ। তৃণমূল বিজেপির থেকে মাত্র ৭ শতাংশ ভোটে এগিয়ে। বিজেপির সুবিধা যে তাদের বিরোধী ভোট স্থায়ী আর মমতার ভোট দোলায়মান।

ঠেলায় না পড়েও বেড়াল গাছে ওঠে। মমতা ব্যানার্জি নিজেকে হিন্দু নারী হিসেবে জাহির করছেন আর বিদেশি সিপিএম জাহির করেছে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অচ্ছুত নন।

বাঁদরের তৈলাক্ত বাঁশে ওঠার চেষ্টার মতো। হস্তশিল্প প্রদর্শনীর কর্মীসভায় অভিষেক ২১৫ আসন পারের লক্ষ্য রেখেছেন। পোড় খাওয়া বিজেপি অনেকটা সংযত। তাই ৯২ আসনের সঙ্গে যা যোগ তাতেই তাদের লাভ।

সূক্ষ্মভাবে দেখলে মনে হতে পারে তৃণমূল শুরু করছে শূন্য থেকে ২১৫-র বেশি আসন পাওয়ার লড়াইয়ে। কারণ তারা ইতিমধ্যেই ২১৪ পেয়ে বসে রয়েছে। হয়তো তা আর থাকবে না ধরে নিয়ে অভিষেক শূন্য থেকে শুরুর ডাক দিয়েছেন যা মমতা প্রকাশ্যে সমর্থন করেছেন। আর বিজেপি লড়ছে ৯২ থেকে ১৪৮ আসন পাওয়ার লড়াইয়ে। মনে রাখা প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির লড়াই বহু রাজ্যের চেয়ে কঠিন। তার বিরুদ্ধে তিন শাসক শত্রু-তৃণমূল, বাম আর কংগ্রেস যারা প্রত্যেকেই একটা বড়ো সময় ধরে এই রাজ্য শাসন করেছে। তাদের রাজনৈতিক ছলচাতুরী আর অভিজ্ঞতার সঙ্গে লড়তে হলে রাজ্য বিজেপির নেতাদের অনেক বেশি সহনশীল আর ধৈর্যশীল হতে হবে।

‘মাঠে মেরে দেব’ এই ধারণা নিয়ে এগোলে কোনোভাবেই এই তিন শাসককে হটানো যাবে না বিশেষত তারা যখন বিজেপি বিরোধিতায় এক ঝাঁকে গিয়ে মিশেছে। সাত দশক ধরে এই তিন দল গুপ্ত ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি আর প্রশাসনিক চাতুরীর ভিতর দিয়ে এই রাজ্য শাসন করে এসেছে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে ধরে বিজেপিকে যদি সমন্বয়ের বার্তা দিতে হয় আর দুষ্টের দমনে এগোতে হয় তাহলে নেতাদের আরও অনেক বেশি মনোযোগী, স্বার্থশূন্য আর নিরহংকার হতে হবে। কোনো সান্ধ্য বা প্রভাতী টিভি চ্যানেলে চেঁচিয়ে নয়, মাছের মতো মানুষের জলে মিশে থাকতে হবে যেমন পেরেছে দিল্লি আর ওড়িশার বিজেপি কার্যকর্তারা।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

রাজ্যে এত মৃত্যু কেন দিদি?

মৃত্যুক্রেতাষু দিদি,

সম্বোধনটা পছন্দ হলো না? আমি আসলে বোঝাতে চেয়েছি যে, এই রাজ্যে কারও মৃত্যু হলে আপনি, আপনার সরকার বা আপনার দল মৃতের পরিবারকে কিনে নিতে চেষ্টা করেন। অনেক সময়ে সেটা পারেনও। ইদানীংকালে রাজ্য রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলা আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক কন্যার মৃত্যুর পরেও আপনি কেনার চেষ্টা করেছেন। প্রকাশ্যে তা বলেছেনও। কিন্তু এত মৃত্যু কেন দিদি?

নারী-নিরাপত্তায় এই রাজ্যের অবস্থান কেমন, আরজি কর কাণ্ডের পর সেই তথ্য এখন বিশ্ববিশ্রুত। এই পরিস্থিতিতে যে কোনো হেনস্থার অভিযোগে পুলিশ-প্রশাসনের অনেক বেশি দায়িত্বশীল, সংবেদনশীল আচরণ প্রত্যাশিত। কিন্তু আমরা সেটা দেখতে পেলাম না সম্প্রতি পানাগড়ের ঘটনায়। কোনো দুর্ঘটনায় কারও মৃত্যু হলে, অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে সত্য প্রকাশ্যে আনা উচিত। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে এমন দুর্ঘটনা না হয় তার জন্য আগাম ব্যবস্থা করাই দায়িত্বশীল প্রশাসনের কর্তব্য। কিন্তু আপনার পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারই আলাদা। এ রাজ্য সে লাইনে হাঁটে না। দুর্ঘটনা ঘটলে— বিশেষত সেই ঘটনায় নিহত বা আহত মানুষটি মহিলা হলে— যে কোনো প্রকারে দুর্ঘটনাগ্রস্তের উপরে দায় চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়ার আগে যে কত 'বে-চাল' ছিল, তদন্তের প্রিয় উপজীব্য সেটিই। ধর্ষণ হলে নির্যাতিতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। আসলে এটা হলো, পুলিশ ও প্রশাসনের যাবতীয় ব্যর্থতা ও উদাসীনতা আড়াল করে দেওয়া। বারবার এই ঘটনা দেখে আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী অভ্যস্ত।

পানাগড়ের কাছে সাম্প্রতিক দুর্ঘটনাটায় এক নৃত্যশিল্পী এবং ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার কর্ণধারের অকালমৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনার পিছনে প্রাথমিক অভিযোগ ছিল ইভটিজিঙের। তা সত্ত্বেও ঘটনার অব্যবহিত পরেই পুলিশ সূত্রে জানা গেল, ইভটিজিং নয়, বরং দুই গাড়ির মধ্যে রেষারেষির কারণেই এমন দুর্ঘটনা।

তদন্ত শুরুর আগেই কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া অত্যন্ত অনুচিত। প্রাথমিক অভিযোগে বলা হয়েছিল, অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় অশালীন মন্তব্য করতে করতে জনাকয়েক যুবক ছোটো গাড়িটিকে ধাওয়া করেছিল। বেপরোয়া ধাবমান গাড়ির ধাক্কাতেই দুর্ঘটনা। এহেন প্রাথমিক অভিযোগে উঠে এসেছিল দু'টি বিষয়, প্রথমত, হাইওয়ের নিরাপত্তা; দ্বিতীয়ত, নারী-নিরাপত্তা। তৃতীয় বিষয়টি তৈরি হলো যখন গাড়ির অন্য আরোহীরা প্রথমে হেনস্থার অভিযোগ করেও পরে তা প্রত্যাহার করে নিলেন এবং আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার সাংবাদিক সম্মেলনে ইভটিজিঙের তত্ত্ব উড়িয়ে 'রেষারেষি'র তত্ত্ব সামনে আনলেন। আমার বিনীত প্রশ্ন, রেষারেষিই যদি হয় এবং দুর্ঘটনার মূল দায় যদি ছোটো গাড়িটিরই হয়ে থাকে, তবে এসইউভি-র আরোহীরা গাড়ি ফেলে পালালেন কেন? জাতীয় সড়কের মতো গুরুত্বপূর্ণ অকুস্থলে, যেখানে দুশো মিটার অন্তর সিসি ক্যামেরা থাকার কথা, সেখানে দুর্ঘটনার তিনদিন পরেও আরোহীদের সন্ধান মিলল না কেন?

সাধারণ নাগরিকের চাওয়া কিন্তু বেশি কিছু নয়। মাস গেলে নিশ্চিত মাইনে, সাধারণ খাওয়া-পরা, বাসস্থান আর প্রয়োজনে চিকিৎসা। এই সাধারণ চাহিদাটুকুর জবাবে এ রাজ্যের নাগরিকেরা দেখে আসছেন শুধুই প্রশাসনের বাগাড়ম্বর, বিপুল দুর্নীতি আর সীমাহীন দীর্ঘসূত্রিতা।

এটা তো দুর্ঘটনা। এছাড়াও মৃত্যুর মিছিল চলছে পশ্চিমবঙ্গে। গত কয়েক সপ্তাহে কলকাতায় বা সংলগ্ন এলাকাতেই অনেক নজির। কোথাও বাড়ির দুই সদস্যকে খুন করে, এক শিশুপুত্রকে গাড়িতে তুলে আত্মহত্যা করতে বেরিয়ে পড়েছেন দুই ভাই, কোথাও অটিজম স্পেকট্রামে আক্রান্ত তরুণীমেয়েকে দড়ির ফাঁসে ঝুলিয়ে সেই একই দড়িতে ঝুলে পড়েছেন পঞ্চাশোর্ধ্ব অবসাদগ্রস্ত পিতা, কোথাও পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে নিজে বিষ খেয়েছেন তরুণী মা।

এসব দেখে দিদি, বৃহত্তর সমাজও এক রকম বিপন্নতা বোধ করছে। আসলে দিদি, নাগরিকের জীবনযাত্রা পশ্চিমবঙ্গের সব ক্ষেত্রেই প্রশাসনের নীতিহীনতা বা দুর্নীতি দ্বারা পীড়িত। সাধারণ নাগরিকের চাওয়া কিন্তু বেশি কিছু নয়। মাস গেলে নিশ্চিত মাইনে, সাধারণ খাওয়া-পরা, বাসস্থান আর প্রয়োজনে চিকিৎসা। এই সাধারণ চাহিদাটুকুর জবাবে এ রাজ্যের নাগরিকেরা দেখে আসছেন শুধুই প্রশাসনের বাগাড়ম্বর, বিপুল দুর্নীতি আর সীমাহীন দীর্ঘসূত্রিতা। যদি পুলিশি তদন্তে জানা যায় যে, বিপুল ঋণভারের পিছনে কোনো রাজনীতি বা ব্যবসার কারবারির যোগ ছিল, অটিস্টিক সন্তানের চিকিৎসার জন্য সরকারের দ্বারে ঘুরেও এক পিতা কিছুই পাননি, তার দায় কী প্রশাসনের নয় দিদি? গোটা রাজ্যে এত অবসাদ বাড়ছে কেন দিদি? কেন এত অসহিষ্ণুতা? আপনি কী এর জবাব আদৌ দেবেন! □

বনফুল এবং তাঁর ছোটো ভাই

সর্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

বনফুলের জীবন, বনফুলের সাহিত্য এসব নিয়ে অনেকে অনেক কথা লিখেছেন। বিদগ্ধ পণ্ডিত সুকুমার সেন 'বনফুলের বনে বনে' নামে একটি অসাধারণ বইও লিখে গেছেন। বিদেশে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বনফুলের ছোটো গল্প পড়ানো হয়। এমবিবিএস পাশ করার পর তিনি জেলা হাসপাতালে চাকরি পান। চাকরির নিয়ম অনুযায়ী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে হাঁটু গেড়ে অভিবাদন জানাতে হবে এটাই ছিল নিয়ম। কিন্তু এটা তাঁর আত্মসম্মানে লাগে। তখন ছিল ব্রিটিশ শাসন। তিনি আর সেই চাকরি নিলেন না। নিজেই স্বাধীনভাবে ডাক্তারি করবেন বলে ঠিক করলেন। আমার বাবার সঙ্গে বনফুলের সম্পর্কের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

আমার পিতৃদেব অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। যিনি মানুষের কাছে বনফুল নামেই সমাধিক পরিচিত। আমার বাবারা ছিলেন ছয় ভাই, দুই বোন। সবচাইতে বড়ো ছিলেন আমার এক পিসিমা। আর তার পরেই বনফুল। ভাই-বোনের মধ্যে দ্বিতীয় জনের সঙ্গে বাবার বয়েসের ফারাকটা অনেক ছিল। বলা যায় পিতা-পুত্রের মতো ছিল। বাল্যকালে বনফুল বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতেন বলে অনেকে তাকে বলতো জংলিবাবু। বনফুল নামটাও তার নেওয়া স্কুলের শিক্ষকদের ভয়ে। কেননা তখন পড়াশোনা বাদ দিয়ে সাহিত্যচর্চা করাটা বাড়ির লোকেরা, শিক্ষকরা ভালো মনে করতেন না। আমার ঠাকুর্দা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। সাহিত্যে অনুরাগ ছিল। বাড়িতে সেই সময় সব ধরনেরই পত্রপত্রিকাই রাখতেন। আমাদের পৈতৃক বাড়ি পূর্ণিয়া জেলার (এখন অবশ্য কাটিহার জেলা হয়ে গেছে) মণিহারীতে যেখানে বনফুল বড়ো হয়েছেন। সেখানে অনেক গুণী মানুষের যাতায়াত ছিল। শুধু আসা নয়, অনেকে রাত কাটিয়ে গেছেন। মণিহারী গ্রামে তখন রাত কাটানোর জায়গা ছিল একটাই, ডাক্তারবাবুর বাড়ি। সেই মণিহারী গ্রামে একবার কবীরের দোহা সংগ্রহ করতে এসে বোলপুরের মানুষ ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী আমাদের বাড়িতে থেকেছেন।

আমাদের সেই বাড়িতে দক্ষিণ দিকে একটা খুব সুন্দর বারান্দা ছিল। বারান্দা ঘিরে ছিল বাগান আর গাছগাছালি। সেই দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বসে একবার আমার ন'জ্যাঠামশাই গৌরমোহন (তিনি ছিলেন আমার তৃতীয় জ্যেঠা। তিনিও ডাক্তার ছিলেন) আর রাজেন্দ্র প্রসাদ রবীন্দ্রনাথের খেয়া কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে প্রায় সারারাত আলোচনা করেছিলেন। অনেকেরই জানা আছে রাজেন্দ্রপ্রসাদ আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ছাত্র হিসেবে তার খুব নামও ছিল। রবীন্দ্রনাথের তিনি ছিলেন অন্ধ ভক্ত। কবির প্রায় সব কবিতাই তার কণ্ঠস্থ ছিল। মণিহারীতে যাতে একটা স্কুল হয় সেই ব্যাপারে রাজেন্দ্রপ্রসাদ খুব চেষ্টা করেছিলেন। সেই মণিহারীর হাটতলায় একবার গান্ধীজী এসে বক্তৃতা দেন। দেশ তখন পরাধীন। কেউ বন্দেমাতরম্ বলতে সাহস পেত না। বাবার মুখে শোনা কথা। বাবারও বয়স তখন অল্প ছিল। সেই হাটতলার সভায় গান্ধীজী চেঁচিয়ে বলেছিলেন, বলুন সবাই বন্দেমাতরম্! গ্রামসুদ্ধ মানুষ চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল বন্দেমাতরম্। বাবা বলতেন সেই ডাক আজও কানে লেগে আছে।

বনফুলের কথায় ফিরে আসি। বনফুল কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে পড়তেন। তখন থেকেই তিনি প্রবাসী ও অন্যান্য পত্রিকায় লিখতে থাকেন। সেই সময় তাঁর ছোটো গল্পগুলি জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। ডাক্তারি পাশ করে সরকারি চাকরি ত্যাগ করে তিনি ঠিক করলেন প্যাথলজিস্ট হবেন। এই ব্যাপারে সেই সময় ডাঃ বনবিহারী মুখার্জী বনফুলকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। যাঁকে নিয়ে পরে বনফুল 'অগ্নীশ্বর' বইটা লেখেন। বনফুল প্যাথলজিস্ট হয়ে ভাগলপুরে চলে যান এবং সেখানেই প্র্যাকটিস শুরু করেন। সেই সঙ্গে পাশাপাশি চালিয়ে যান সাহিত্যচর্চা। লেখালেখি, ডাক্তারি বইপড়া, রান্নার এক্সপেরিমেন্ট, বাগান চর্চা, আকাশের গ্রহ নক্ষত্র, কলকাতা থেকে বন্ধুবান্ধবদের আসা-যাওয়া— এসব নিয়ে বনফুল ভাগলপুরে বেশ আনন্দেই থাকতেন।

তার আরেকটি ছিল পক্ষীচর্চা। 'ডানা' নামে তার এ বিষয়ে অসাধারণ একটা উপন্যাস আছে। তার চরিত্রের মধ্যে একটা প্রচণ্ড দৃঢ়তা ছিল। তিনি কাউকে তোয়াজ করতেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়ে আলাপ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। সে কথা সজনীকান্ত দাস (শনিবারের চিঠি) বনফুলকে জানালে বনফুল বলেছিলেন, 'আমি ডাক্তার মানুষ কল না পেলে কোথাও যাই না।' সেটা শুনে রবীন্দ্রনাথ বনফুলকে শান্তিনিকেতনে আসার জন্য আহ্বান জানান। পরে সে সব কথা বনফুল তাঁর রবীন্দ্রস্মৃতি বইটিতে লিখে গেছেন। তবু দু' একটা ঘটনা জানাতে ইচ্ছে করছে। বনফুল যখন বোলপুরে গিয়ে পৌঁছুলেন তখন খুব ভোর। স্টেশনে গাড়ি ছিল তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য। সময়টা শীতকাল। বনফুল গিয়ে দেখেন রবীন্দ্রনাথ অত ভোরে স্নান করছেন। জলখাবার খেতে খেতে রবীন্দ্রনাথ বনফুলকে বললেন আজ কিছু হবে না। কাল তোমার জন্য মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা থাকবে। পরের দিন একটা নৃত্যনাট্যের স্টেজ রিহার্সাল ছিল। বনফুলকে সেটাই বিকেলে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে নিয়ে গেলেন। ছাত্রীরা সব মঞ্চে নাচছে। রবীন্দ্রনাথ বনফুলের কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগছে!' বনফুল বললেন, 'খুব ভালো বিশেষত একদম ডান দিকের শ্যামবর্ণা মেয়েটি তো খুবই ভালো!' রবীন্দ্রনাথ খানিকটা অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই মেয়েটিকেই তোমার ভালো লাগছে কেন!' বনফুল উত্তর দেন, 'মেয়েটি বেশ সুন্দরী।' রবীন্দ্রনাথ হেসে উঠেছিলেন।

বনফুল রবীন্দ্রনাথকে কিছুটা যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে ওঠেন, 'এইভাবে মেয়েদের যে আপনি নাচ শেখাচ্ছেন সেটা কি ঠিক হচ্ছে! মেয়েরা

বেশি বার মুখো হয়ে পড়লে সমাজের ভারসাম্য হারিয়ে যাবে না!' রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে বলেছিলেন, 'একদিন আসবে মেয়েরা এই নেচেই রোজগার করবে আর পুরুষগুলো সব ঘরে বসে থাকবে!' আরেকবার বনফুলের স্ত্রী লীলাবতী বাড়িতে নিজের হাতে সন্দেশ তৈরি করে রবীন্দ্রনাথের জন্য নিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ সন্দেশ ভেঙে এক টুকরো মুখে দিতেই মুখটা খুব গম্ভীর হয়ে যায়। গম্ভীর মুখেই বলে ওঠেন, 'এত দিন জানতাম বাংলাদেশে দুজন রসস্রষ্টা আছে। একজন দ্বারিক আর দ্বিতীয়জন রবীন্দ্রনাথ, এখন দেখছি তৃতীয় জনের আবির্ভাব হলো!' তখন দ্বারিকের মিষ্টির খুব নাম ছিল। বনফুল লেখা নিয়ে যেমন এক্সপেরিমেন্ট করেছেন লেখার সময় নিয়েও এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। অনেক সময় সন্ধ্যের আগেই খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে নিতেন। ডাক্তারি কাজকর্ম সেরে খেয়েদেয়ে দুপুরে আবার লিখতে বসতেন। সাহিত্যের সব পথেই হেঁটেছেন তিনি।

একবার রবীন্দ্রনাথ খুব ঝুঁকে লিখছেন। তা দেখে বনফুল বলে উঠলেন, অত ঝুঁকে লিখছেন কেন! আজকাল তো নানান ধরনের টেবিল বেরিয়েছে!' রবীন্দ্রনাথ হেসে বলে উঠলেন, 'কলসীর জল ফুরিয়ে এসেছে! উপুড় করে না ঢাললে জল বেরুবে না!'

নাট্য সাহিত্যে জীবনীমূলক নাটক বনফুলের হাতে অন্য মাত্রা পেয়েছিল। 'শ্রীমধুসূদন', 'বিদ্যাসাগর'-এর মতো তাঁর বহু ছোটো ছোটো একাঙ্ক নাটক আছে। ছেলেদের পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য তাঁকে অনর্গল লিখে যেতে হয়েছে। কিন্তু একটা লেখার সঙ্গে আরেকটা লেখার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর প্রতিটি লেখা ছিল বৈচিত্র্যময়। সদাশিব এই মানুষটি সাতদিনের বাজার খরচ থাকলেই সন্তুষ্ট থাকতেন। তার ভাগলপুরের বাড়িটা ছিল বেশ বড়ো খোলামেলা। সেখানে তাঁর একটা ল্যাবরেটরি ছিল। সেখানে তিনি প্যাথলজির কাজ করতেন। কাজ মিটে গেলে বসে বসে লিখতেন।

আমার বাবার ছাত্রজীবন কাটে বোলপুরে। শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেজ এদের সান্নিধ্যে। সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নাটক করতেন রামকিঙ্কর। আর আমার বাবা ছিলেন রামকিঙ্করের এক নম্বর চ্যালা। সেই নাটকে সত্যজিৎ (পরে বিখ্যাত চিত্র পরিচালক। তখন ছিলেন ছাত্র।) মঞ্চ সাজাতেন। সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরও অনেকে কেউ গানে, কেউ অভিনয়ে কেউ-বা মঞ্চের বাইরে থেকে অংশ নিতেন। আরেকজনও ছিলেন, তিনি হলেন বলরাজ সাহানি। বলরাজ সেই সময় শান্তিনিকেতনে হিন্দি পড়াতেন। পরে বোম্বে চলে গিয়ে অভিনেতা হিসেবে খুব খ্যাতি অর্জন করেন। শান্তিনিকেতনের পাট শেষ করে বাবা বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। আমার জ্যেঠারা প্রায় সবাই ডাক্তার। তাই আমার বাবাও সেদিকে পা বাড়িয়েছিলেন। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে বাবা তাঁর সহপাঠীদের নিয়ে নাটক করতেন। সেখানে বাবা নিজে লিখতেন এবং ডিরেকশন দিতেন।

তখন ডাক্তারি ফাইনাল পরীক্ষাটা কলকাতাতেই হতো। ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে হাতে সময় থাকাতে বাবা বিমল রায়ের 'উদয়ের পথে' ছবিটা দেখে ফেলেন। ছবিটা দেখার পর তিনি মত বদলান। চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। এতে আমার ঠাকুরদা খুব চটে যান। বনফুলই তাঁকে ঠাণ্ডা করেন। বাবার বিয়ে বনফুলই দিয়েছিলেন। বনফুল তখন ভাগলপুরে। লেখক হিসেবে তখন তার যথেষ্ট নাম। কোনো একটি অনুষ্ঠানে বনফুল প্রধান অতিথি হন। সেখানে মায়ের নৃত্য দেখে বনফুল এবং আমার জেঠিমা লীলাবতী দেবী আমার মাকে পছন্দ করেন। খোঁজ খবর নিয়ে সন্তুষ্ট হলেন। জানলেন পালটি ঘর। বনফুল তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে চিঠিতে লিখলেন, 'অমুক তারিখে তোমার বিবাহ ঠিক হইয়াছে। তুমি অবিলম্বে একটি ভালো বেনারসি শাড়ি কিনিয়া চলিয়া আসিবে।' বাবা তখনও পরিচালক হয়ে ওঠে নি। এমপি স্টুডিয়োতে অ্যাসিস্টেন্টের কাজ করেন। পাইকপাড়ায় একটা ভাড়া বাড়িতে থাকেন। চিঠি পেয়েই বাবা এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বাগবাজার থেকে শাড়ি কিনে ভাগলপুরে বিয়ে করতে চলে যান। দাদার উপর কোনো কথা বলার স্পর্ধা তাঁর ছিল না।

শুনেছিলাম বউভাতে বনফুল অতগুলো লোকের জন্য মাংস রান্না করেছিলেন। তিনি নিজে যেমন ছিলেন খাদ্যরসিক, তেমনি লোককে খাওয়াতেও ভালোবাসতেন। বাবার প্রথম ছবি 'কিছুক্ষণ', সেটা বনফুলেরই এক অসাধারণ গল্প। কিছুক্ষণ ছবিটা গুণীজনদের খুবই সুখ্যাতি পেয়েছিল। এরপরে বাবা বনফুলের 'কঞ্চি' নাটকটি নিয়ে ছবি করেন। তবে কঞ্চি নামটা বদলে 'বর্ণচোরা' রেখেছিলেন। এই ছবিটিও সেই সময় বেশ ভালোই সফলতা পায়। বর্ণচোরার পর বাবা বনফুলের 'অগ্নীশ্বর' গল্পটি নিয়ে ছবি করার কথা ভাবেন। বাবা গল্পটা একটু পরিবর্তন করেছিলেন। গল্পে শেষের দিকে অগ্নীশ্বরের সাধু হয়ে যাওয়ার একটা ব্যাপার ছিল। যেটা বাবার কাছে মোটেই গ্রহণীয় বলে মনে হয়নি। বনফুল একটু ক্ষুণ্ণ হলেও বনফুলের স্ত্রী শ্রীমতী লীলাবতীদেবী বাবাকেই সমর্থন করেছিলেন। আজও সাধারণ মানুষ অগ্নীশ্বরের কথা বলে। এর বেশ কিছুটা পরে বাবা বনফুলের 'মন্ত্রমুগ্ধ' নাটকটি নিয়ে ছবি করেন। মন্ত্রমুগ্ধ ছবিতে বনফুল একটা গানও লিখে দিয়েছিলেন। সেটার সুর দিয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

এক সময় বনফুল ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতার লেকটাউনে চলে আসেন। ছেলেরা সব কলকাতাতেই কাজকর্ম করতো। মেয়েদেরও বিবাহ হয়েছিল কলকাতাতেই। তাঁর নিজেরও বয়েস বাড়ছিল। ফলে কলকাতাতে যাওয়াই ঠিক করলেন। ভাগলপুরের সেই পরিবেশ কলকাতায় ছিল না। সেটা খুব স্বাভাবিক। এখানে ছিল সভা সমিতি আর মানুষের উপদ্রব। তবু তিনি তারই মধ্যে আনন্দ খুঁজে নেবার চেষ্টা করতেন। এই সময় তিনি ছবি আঁকতেন। ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে 'নবীন দত্ত' আর 'লী' এই দুটি অসাধারণ উপন্যাস লেখেন। আর ছোটো ছোটো গল্প লেখা তো চলতেই। এছাড়া ডায়েরিও লিখতেন। এই ডায়েরির লেখাগুলো পরে 'মর্জি মহল' নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। মনে পড়ে বিজয়াদশমীর দিন আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর লেকটাউনের বাড়িতে মিলিত হতাম। গুরুজনদের প্রণাম, কোলাকুলি, গান, আনন্দে সন্ধ্যেটা ভরে উঠতো। বনফুলকে একটা ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। বনফুল ছিলেন অসাধারণ কল্পনাশক্তি ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। আমার কৈশোরকালেই বনফুল তাঁর সেই কল্পলোকে হারিয়ে যান।

(লেখক বনফুলের ভ্রাতুষ্পুত্র)

বামপন্থী-অতিবামপন্থী ও রাজ্যের শাসক দলের সংযোগেই ছাত্র-সমাজ বিপথে পরিচালিত

ফের সংবাদ-শিরোনামে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। গত প্রায় দেড় দশকে অর্থাৎ বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে প্রায়শই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে। সেদিন একটি জনপ্রিয় টিভি শোয়ের সঞ্চালক বলেই ফেললেন ছাত্র মানেই নাকি প্রতিষ্ঠান-বিরোধী। অর্থাৎ ওই সঞ্চালকের মতে, একজন প্রকৃত ছাত্রের ধর্ম হওয়া উচিত প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্ন করা, তাকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করা। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা এবং সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যে একটি স্থূল পার্থক্য আছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেটি প্রায় অনুক্তই থেকে যায়।

প্রথমত, এবার ছাত্র-ছাত্রীদের যে দাবিকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলের সূত্রপাত সেই দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল না হওয়ার কোনো কারণ নেই। শুধু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন, দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন হয় না। নেহাত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের আওতাভুক্ত, নইলে রাজ্যের পুরসভাগুলিতে যেমন বছরের পর বছর নির্বাচন না করে ফেলে রাখা হয়, ঠিক সেভাবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের পর বছর নির্বাচন হতে দেয় না রাজ্যের শাসক দল, তাতে এদের হাতে লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচন করানোর ক্ষমতা থাকলে, সেটাও যে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে হতো না— একথায় আশাকরি অত্যুক্তি থাকবে না। আসলে রাজ্যের শাসক দল জনমতকে যাচাই করতে ভয় পায়, তাই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনই হোক, কিংবা পুর-নির্বাচন, তাদের এই অনীহা। সমস্যার সূত্রপাত এখান থেকেই।

ঘটনার দিন শাসক দলের শিক্ষক-সংগঠন ওয়েবকুপার সমাবেশ উপলক্ষ্যে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। সেখানেই তাঁর গাড়ি ঘিরে জঙ্গি-বিক্ষোভ প্রদর্শন, অতঃপর রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি এক আন্দোলনরত ছাত্রের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া ইত্যাদি কারণে উত্তাল হয় রাজ্যের ছাত্র-রাজনীতি। এখানে আমাদের কোনো মন্তব্য করা সাজে না। শুধু এতটুকুই বলার যে, কোনো কিছুরই দাবিতে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির কাঁচ ভেঙে দিয়ে অশান্তি করা যেমন ছাত্র-সুলভ আচরণ নয়, তেমনি শিক্ষামন্ত্রীরও তাঁর গাড়ির চালককে সংযত করা কর্তব্য ছিল। তাহলে এই অনভিপ্রেত, অমানবিক ঘটনা এড়ানো যেত।

জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থান হাড়ে কাঁপন ধরিয়েছে এই প্রথমসারির শিক্ষাঙ্গনে এতকাল মৌরসিপাট্টা চালানো মাওবাদী ও সংসদীয় গণতন্ত্রে তথাকথিত আস্থাশীল বামপন্থীদের। রাহু-কেতুর এই যোগই রাজ্যের ছাত্র-আন্দোলনের নিয়ন্তা হওয়ার চেষ্টা করছে। যাকে রুখতে না পারলে এরাজ্যের গর্ব ছাত্র-সমাজের ভবিষ্যৎ নিকষ কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন।

যা বোঝা গেল, দু'পক্ষেরই দোষ ছিল। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন উঠছে, বাবুল সুপ্রিয়র ঘটনা মাথায় রেখে জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে, যাদবপুরে রাজ্য কিংবা কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রতিনিধিরাই বারংবার কেন আক্রান্ত হচ্ছেন?

উত্তরটা বোধহয় সবারই জানা। প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার মোড়কে যাকে ঢেকে রাখা হয়। যে দর্শন গোটা পৃথিবী থেকে অবলুপ্তির পথে, যাদের সংসদীয় গণতন্ত্রে কোনোদিনই আস্থা ছিল না, ভারতীয় রাজনীতি তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী। শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে সংসদীয় গণতন্ত্রে আস্থা রাখার ভান করে যারা চৌত্রিশ বছরে রাজ্যটাকে পেছনের সারিতে নিয়ে গিয়েছে, আজ মানুষ তাদের শূন্য করে দিলেও তারা সংসদীয় গণতন্ত্রে অনাস্থা পোষণকারী কমরেডদের নিয়ে রাজ্যের ছাত্র-সমাজকে অশান্ত করার পরিকল্পনা-মাফিক খেলায় নেমেছে। এবং এই সুযোগটা তারা পেয়েছে রাজ্যের শাসক দলের জন্য। আমাদের ভুললে চলবে না যে, রাজ্যের শাসক দলের অনেক কর্তাব্যক্তিই পুরানো মাওবাদী-নেতা। গোলমাল তৈরিতে এরা সিদ্ধহস্ত। এমনিতে এই দলের ক্ষমতা নেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধিক পরিসরে প্রবেশ করে। তাই বিগত দেড় দশকে মুড়ি-মিছরির দর এক করে ফেলেছে। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থান হাড়ে কাঁপন ধরিয়েছে এই প্রথমসারির শিক্ষাঙ্গনে এতকাল মৌরসিপাট্টা চালানো মাওবাদী ও সংসদীয় গণতন্ত্রে তথাকথিত আস্থাশীল বামপন্থীদের। রাহু-কেতুর এই যোগই রাজ্যের ছাত্র-আন্দোলনের নিয়ন্তা হওয়ার চেষ্টা করছে। যাকে রুখতে না পারলে এরাজ্যের গর্ব ছাত্র-সমাজের ভবিষ্যৎ নিকষ কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন। □

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল হতে হিন্দু নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়ার এখন সময়

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

বহুত্বের মাঝে ভারতে মিলন মহান। অনেক মত বিশ্বাস ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে শান্তি ও সম্প্রীতির এক সুখের আবাসভূমির নাম ভারত। বিদেশি হানাদারদের এই শান্তি যেন সইছিল না। তারা ভারতের শান্তি ও সমৃদ্ধিকে বিনষ্ট করার জন্য নানা ফন্দিফিকির করে বারবার ব্যর্থ হওয়ার পরেও কূটচাল বন্ধ করেনি। সম্প্রতি এই কূটচাল আরও তীব্র উঠেছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের পরে এক এক করে ঝুলি থেকে বিড়াল বের হতে শুরু করেছে। আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করে আসছিলাম আগরতলায় বাংলাদেশের ভিসা অফিস হওয়ার পরে সেটি সহকারী হাইকমিশন অফিসে রূপান্তরের আগে ও পরে যেখানে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেদের আনাগোনা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে গেছে। অসম-সহ অন্যান্য রাজ্য হতে তারা এসে হঠাৎই ভিসা পেয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদ্রাসা ও মজহবি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাতায়াত করে। বিশেষ করে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ফেনী, চাঁদপুর, খুলনা ও বরিশালে শতশত এমন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

বিষয়টি গোয়েন্দা দপ্তরের নজরেও এসেছিল। কিন্তু তেমন কোনো লাভ হয়নি। বরং ভিসা প্রদান প্রক্রিয়ায় ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকদের আইনি ক্ষমতাও দেওয়া ছিল অনেক। একই সঙ্গে চলছিল বিশাল অঙ্কের আর্থিক লেন-দেনও। এইসকল বিষয় নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে অনেকবার। স্থানীয় প্রশাসন এই ব্যাপারে কী ভূমিকা নিয়েছে আমাদের জানা নেই। একটি বিশ্বস্ত সূত্রমতে জানা গেছে, এইসব ভিসা প্রতিবেশী দেশের জেহাদিদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের কাজে বেশি ব্যবহৃত হতো। বাংলাদেশের জেহাদিদের বারবাড়ন্ত এখন ভারতেও বিস্তৃত হয়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন। ত্রিপুরায় মন্দিরে চুরি, প্রতিমা ভাঙা, পশ্চিমবঙ্গে প্রতিমা বিসর্জনে বাধা, সরস্বতী পূজায় কলকাতার মতো শহরেও হাঙ্গামা এবার আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। এগুলি কীসের লক্ষণ? আগরতলাকে নিরাপদ করিডোর করে নিতে মুসলমানরা এখন আরও বেশি তৎপর। তাদের এই তৎপরতার আড়ালে কী চলছে আমাদের জানা নেই।

একই সঙ্গে গত বছরে কলকাতার আমেরিকান কনসাল জেনারেল ত্রিপুরার আনাচে কানাচে ভ্রমণ করে গেছেন। তিনি উপজাতীয় লোকেদের নৃত্য উপভোগ করে গেছেন। তার অবস্থানকালে কারা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জানা না থাকলেও তিনি তো এমনি এমনি এখানে আসেননি। নির্দিষ্ট অ্যাজেন্ডা নিয়েই তিনি এখানে ঘুরে গেছেন। হিন্দু প্রধান রাজ্যে তিনি কোনো হিন্দু প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেননি। বিষয়টা কীসের ইঙ্গিত দিচ্ছে?

মুসলমান ও খ্রিস্টান তোষণ ভারতের নিজস্ব স্বকীয়তাকে শত শত বছর ধরে নষ্ট করে চলেছে।

সাম্প্রতিককালে ত্রিপুরায় দুটি বিশেষ শ্রেণীর মত চর্চা লক্ষণীয় মাত্রায় পৌঁছেছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে উপজাতিদের একটি অংশ ধর্মান্তরিত হয়ে চলেছে। তারা সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ভিন্ন মতে ধর্মান্তরিত হয়ে চলেছেন। ফলে অন্য রাজ্যের দেশবিরোধের সঙ্গে তাদের মেলবন্ধন শুরু হয়েছে। ভাব জমে উঠেছে উঁচু মাত্রায়।

অন্যদিকে, আরেকটি বিশেষ গোষ্ঠীর লোকেরা ছড়িয়ে পড়ছে রাজ্যের সর্বত্র। তারা উপজাতীয় মেয়েদের সঙ্গে প্রথমে ভাব জমায়, পরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সরকারি পতিত জমিতে বাড়িঘর গড়ে তোলে। পরে এই সকল জমি বন্দোবস্ত নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। এমনও দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরার একদম প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি-দুটি বসতি দিয়ে শুরু করে কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে অনেক পাড়া গড়ে উঠে। এই সকল পাড়ার বাসিন্দারা বহিরাগত এবং ভিন্ন মতালম্বী। তাদের জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায় অতিমাত্রায়। উল্লেখিত বিষয়গুলি একদম ছোটো হলেও সেগুলি ডালপালা বিস্তার করে সম্প্রসারিত হতে বেশি সময় লাগে না।

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, সময়ে অসময়ে বিকট শব্দে মাইক বাজিয়ে শব্দ দূষণ করে চলেছে। শুধু তাই নয়, তারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে। যার ফলে বিক্ষিপ্ত ভাবে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেই চলেছে। বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা সকলকে ভাবিয়ে তোলে।

এদিকে গত বছরের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক 'জনকণ্ঠ'-এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। প্রতিবেদনে আমেরিকার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে পত্রিকাটি বিস্তারিত তথ্য তুলে

ফঃ ২

ধরেছিল। মণিপুরের ঘটনায় বিদ্রোহীদের কাছে যে সকল অস্ত্র পাওয়া গেছে সেগুলি আমেরিকা থেকে এসেছে বলে জানানো হয়েছিল। সারা মণিপুরে ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে গেলেও বিদ্রোহীরা আমেরিকার ইলন মাস্কের স্টার লিংক ইন্টারনেট ব্যবহার করে নৃশংসতা চালিয়ে গেছিল। বিদ্রোহীদের হাতে স্যাটেলাইট ফোনের সুবিধা কী করে এল তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। এর পেছনে কী উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাও খতিয়ে দেখা আবশ্যক। বহুদিন ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, সেভেন সিস্টার্সকে ভারতের মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মায়ানমার ও বাংলাদেশের কিছু অংশ নিয়ে একটি খ্রিস্টান দেশ প্রতিষ্ঠার। পেছনে যুক্তি খাড়া করে অনেকেই বলতে চাইছেন দক্ষিণ এশিয়ায় হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ থাকলেও খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনো দেশ নেই। এই অঞ্চলের দেশগুলোতে খ্রিস্টান মতাবলম্বীর সংখ্যাও কিছুটা কম। ভারতে খ্রিস্টান অধিবাসীদের আনুপাতিক সংখ্যা ৫ শতাংশেরও কম।

তবে সেভেন সিস্টার্সের অন্তর্ভুক্ত মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম ও নাগাল্যান্ডের অধিবাসীদের প্রধান অংশ খ্রিস্টান। এছাড়াও মিজোরামের জনগণের বিশাল একটা অংশ খ্রিস্টান দেশ গঠনে অবৈধ অভিবাসীদের আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। জোর করে জমি দখল করে নিয়ে স্থানীয় লোকদের উচ্ছেদ ও বিতাড়িত করে চলেছে যা প্রকাশিত হচ্ছে না। তারা স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসন গঠনের কাজও করে চলছে বলে জানা গেছে। ভৌগোলিক অবস্থার কারণে অনেক সময় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া বিলম্বিত হতে বাধ্য হচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। এছাড়া এ অঞ্চলটি অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকার কারণে বিদেশি অর্থদাতা সংস্থাগুলি তাদের কাজ সংঘটিত করতে বিলম্ব করছে না। সাহায্যের কথা বলে তারা এখানে খ্রিস্টান শাসন গড়ে তোলার জন্য অর্থ ব্যয় করে। তারা সুযোগ নিচ্ছে নানান জনমুখী কাজকর্মের মাধ্যমে। ফলে, নগদ প্রাপ্তিতে এই সকল এলাকার লোকেদের নির্ভরতা ও বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। এই সুযোগে স্বাধীনতার দাবিতে এই রাজ্যগুলোতে গড়ে উঠেছে বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহী গোষ্ঠীও। তারা অস্ত্র, অর্থ পাচ্ছে বিদেশ থেকে। ভারত সরকার এইসব বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করলেও বিচ্ছিন্ন অঞ্চলটির সঙ্গে চীন-মায়ানমারের সম্পর্ক নিবিড় থাকায় অনেক সময় বিদ্রোহীরা তাদের তৎপরতা চালিয়ে যেতে পারছে অনায়াসে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাত রাজ্যের সঙ্গে মায়ানমার ও বাংলাদেশের কুকিচিন ও খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে আভ্যন্তরীণ সংযোগের সুবিধা থাকার ফলে তাদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ এরই মধ্যে খুবই দৃঢ় হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পরপরেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে গেছে। ড. ইউনুস ক্ষমতায় বসার আগেই ভেতরের কথা উগরে দিয়ে বললেন তিনি ভারতের সেভেন সিস্টার্সকে অশান্ত করে তুলবেন। তাঁর এই বক্তব্য ফেলে দেবার মতো নয়। আমেরিকা থেকে হিংসার দীক্ষা নিয়ে তিনি এমনটাই বলবেন সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এবং তিনি খুঁটিনাটি ডিজাইন করেই আগাম কথাটি বলে ফেলেছেন। তার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জেলখানা হতে সমস্ত ভারত বিরোধীদের মুক্ত করে দিয়ে নিয়মিত কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। কাজ পেয়ে তারাও বসে নেই। তারা বিদেশি অর্থায়নে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে একটা জিনিস পরিষ্কারভাবেই একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ভারতের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে ইসলামি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যে কোনো সময়ের চাইতে হাজার গুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান সীমান্তের দু'পাশেই স্থাপিত। তার উপরে অরেকটি বিষয় গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে, শুধুই সীমান্ত এলাকায় এ সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে কেন?

অন্যদিকে খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের এই অঞ্চলে সম্পর্ক খুবই ভালো। আরও দেখা গেছে, আমাদের দেশীয় ও আন্তর্দেশীয় চেক পোস্টগুলির নিয়ন্ত্রণ একটি বিশেষ শ্রেণীর লোকেরাই করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। ক্ষমতার পালাবদলের পরেও কিন্তু ওই একই শ্রেণীর লোকেরাই এপার-ওপার দু'পারই নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। ফলে আমদানি রপ্তানি ব্যবসাও তারাই নিয়ন্ত্রণ করে। যার ফলে একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসা এই অবস্থা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের হতাশ করে চলেছে। আমদানি রপ্তানির আড়ালে কী হচ্ছে এই সকল চেক পোস্টগুলিতে কেউ স্পষ্ট বলতে পারবে না। হিন্দু ব্যবসায়ীদের সেখানে অসহায়ের মতো সকল অন্যায় অত্যাচার, চাঁদাবাজি সহ্য করতে হচ্ছে। হিন্দুদের অনুভূতিতে আঘাত মেনে নেওয়ার মতো নয়। সার্বিক পরিস্থিতি ও বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে, অসম, অরুণাচল, মিজরাম, মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরায় ভিতরে ভিতরে কী চলছে। প্রায় সবখানেই হিন্দুদের উপরে বিভিন্ন রকমের অন্যায় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মুসলমান ও খ্রিস্টান তোষণ ভারতের নিজস্ব স্বকীয়তাকে শত শত বছর ধরে নষ্ট করে চলে আসছে। শুধু ভোটের কারণে হিন্দুদের অস্তিত্ব আজ চরম হুমকির সামনে। একদিকে বিদেশিদের ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে দেশীয় চক্রীরা ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করার নানান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাদের এই সকল ষড়যন্ত্র এখনই স্বমূলে বিনাশ একান্ত আবশ্যক।

With Best Compliments from -

A Well Wisher

ব্রাহ্মণ পরিচয়ের আড়ালে মমতা ব্যানার্জি নিজের অপরাধী চরিত্রটি লুকোনোর চেষ্টা করছেন

সাধন কুমার পাল

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি শিশুপালের একশোটি অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। পরবর্তীতে মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে প্রধান অতিথি করা হলে শিশুপাল রেগে গিয়ে তাঁকে কটূক্তি করতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ একশোটি অপমান সহ্য করেন। শিশুপাল ১০১ তম অপমান করলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করে শিশুপালের মস্তকছেদন করেন। মহাভারতের এই কাহিনি সকলের জানা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ১০০টি অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়ার মর্মার্থ আসলে হিন্দু সমাজের সহনশীলতা, ধৈর্যশীলতা ও শালীনতাকে তুলে ধরে। তবে একটি সময় পরে হিন্দুসমাজ যে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় থাকে না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিশুপাল বধ সেই বিষয়টিকেই প্রতিফলিত করে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মহাভারতের শিশুপাল বধের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বারবার তিনি হিন্দু সমাজের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন। তাঁর জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে কেউ প্রশ্ন না করা সত্ত্বেও তিনি যে ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মেছেন সেটা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ 'ঠাকুরঘরে কে, আমি তো কলা খাইনি' গোছের মনস্তত্ত্ব এখানে কাজ করছে। তাঁর ব্রাহ্মণ পরিচয়ের আড়ালে হিন্দু সমাজের প্রতি দিনের পর দিন যে অপরাধ করে চলেছেন, সেই অপরাধী চরিত্রটি লুকানোর চেষ্টা করছেন বলেই সাধারণ মানুষ মনে করছেন।

ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে হিন্দু সমাজকে বিপন্ন করার খেলায় তিনি একা নন। ওপার বঙ্গেও ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেওয়া পিনাকী ভট্টাচার্যের মতো কিছু কুলাঙ্গার যারা জামাত শিবিরের দালালি করে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার খেলায় মেতে রয়েছেন।

মমতা ব্যানার্জি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতাকে হুমকি দিয়েছেন, একশ্রেণীর মানুষ যদি রাস্তায় নামে তবে সামলানো যাবে তো? তিনি কাদের রাস্তায় নামার কথা বলেছেন সেটা রাজ্যের মানুষের বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি। তাঁর হাতে পুলিশ, তিনি মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ মন্ত্রী, তাহলে একশ্রেণীর মানুষ রাস্তায় নামলে কে সামলাবে?

এবার প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভে ৬৬ কোটি পুণ্যার্থী স্নান করেছেন। এই প্রতিবেদক নিজে সেই ৬৬ কোটির অংশ। সকলেই মহাকুম্ভে স্নান করে পরিতৃপ্ত এবং পরিপূর্ণতার অনুভূতিতে আপ্লুত। বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন সনাতন তথা হিন্দু সংস্কৃতির এই আড়ম্বরহীন মহামিলন দেখে সকলেই অভিভূত। ভারতবর্ষের বোধহয় এমন কোনো গ্রাম বা জনপদ নেই যেখান থেকে কেউ-না-কেউ এবার মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করেননি।

সারা বিশ্বে মানব সভ্যতার ইতিহাসে এত বড়ো মিলনমেলার দৃষ্টান্ত আর কোথাও নেই। এটা সকল ভারতবাসীর জন্য গর্বের। কোটি কোটি মানুষ টাকাপয়সা, ধনসম্পদ বা কোনো সুবিধা লাভের আশায় নয়, শুধুমাত্র একটি আধ্যাত্মিক ভাবনায় 'সর্বে ভবন্তু সুখীনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া' মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে স্নানের ঘাটে একত্রিত হতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এই অমৃতকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলে কটাক্ষ করে কোটি কোটি হিন্দুর ভাবাবেগে আঘাত করেছেন। তাঁকে এই অধিকার কে দিয়েছে? এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি আবার নিজেকে ব্রাহ্মণ হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি তিনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন, ' জেনে রাখুন আমিও কিন্তু ব্রাহ্মণ

পরিবারের মেয়ে। আমার বাবা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন।' তিনি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছেন বলেই হিন্দুদের অপমান করার অধিকার অর্জন করেননি। তাঁর মধ্যে হিন্দুত্বের কোনো সংস্কার আছে বলে কেউ মনে করে না। কারণ হিন্দু সংস্কারের প্রথম শর্ত হলো অন্যের বিশ্বাসের প্রতি, অন্যের ধর্মাচরণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ থাকা। এই শ্রদ্ধাবোধের অভাব রয়েছে বিভিন্ন সেমেটিক রিলিজিয়ন গুলোতে। যেমন যিশুর অনুগামীরা বিশ্বাস করে যে গডে বিশ্বাসী না হলে তাদের কখনোই হেভেন প্রাপ্তি হবে না। ইসলামের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। অবিশ্বাসীদের বেহস্ত প্রাপ্তি তো দূরের কথা, বরং তাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। মমতা ব্যানার্জি ঠিক সেমেটিক রিলিজিয়নে বিশ্বাসীদের সুরেই কথা বলছেন।

মমতা ব্যানার্জি মাঝে মাঝে কিছু কিছু মন্ত্র বলার চেষ্টা করেন। সেই রেকর্ডিংগুলো তিনি শুনলে নিজেই বুঝতে পারবেন তাঁর বলা মন্ত্রগুলি কতটা বিকৃত ও ভুলে ভরা। তাঁর সেপাই-সান্ত্রীদের বললেই তারা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সেই বিকৃত মন্ত্র-বলা ভিডিয়োগুলি খুঁজে দেবে। বিধানসভায় তিনি সরস্বতীপূজার ছবি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। তাঁর দলের সম্পদ জেহাদিরা বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে সরস্বতীপূজায় বাধা দিল অথচ তিনি তাদের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না। একবারের জন্য তাদের হুঁশিয়ারি দিলেন না। হিন্দুদের কেটে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়ার হুমকি যিনি দিলেন সেই জেহাদি এমএলএ-কে কোনো কথাই বললেন না। 'হিন্দু হয়ে জন্মানো দুর্ভাগ্যের' এমন কথা বলা তাঁর দলের জেহাদি রত্ন তথা কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে তিনি একটি কথা বলেছেন বলে কারও জানা নেই। সেই তিনিই আবার নিজেকে হিন্দু বলে জাহির করছেন। মনে রাখতে হবে, হিন্দু একটি বিশ্বাসের নাম, হিন্দু একটি আচরণের নাম, একটি সংস্কারের নাম। তার বিন্দুমাত্র তাঁর মধ্যে নেই।

হ্যাঁ, এবারের কুম্ভমেলায় কিছু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। তাতে কয়েকজন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে। সেটা দুঃখের, বেদনার। সেটা না হলেই ভালো হতো। হয়তো-বা প্রশসানের পক্ষেও কোনো ত্রুটি ছিল, তবে সেটা ইচ্ছাকৃত ভুল তা কিন্তু বলা যাবে না। কারণ কোটি কোটি মানুষের ভিড় সামলানোর প্রশিক্ষণ পৃথিবীর কোথাও নেই, সম্পূর্ণটাই উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের জন্য এক নতুন পরিস্থিতি, অভিজ্ঞতাহীন এক নতুন চ্যালেঞ্জ ছিল। মমতা ব্যানার্জি গঙ্গাসাগর মেলার সঙ্গে প্রয়াগরাজের কুম্ভমেলার তুলনা করেছেন। গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থী আসেন কয়েক লক্ষ। কুম্ভমেলায় আসে কোটি কোটি। এই দুটো মেলা জনসমাগমের নিরিখে কখনোই এক হতে পারে না। কুম্ভমেলায় ত্রিশজনের মৃত্যুকে হাতিয়ার করে মমতা ব্যানার্জি রাজনৈতিক সুবিধা তোলার খেলায় মেতেছেন। তাঁর কাছে এটা খেলা হতে পারে। কিন্তু এই পুণ্যার্থীদের মৃত্যু হিন্দু সমাজের মধ্যে এক শোকের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তাই তাঁদের মৃত্যু নিয়ে এই রাজনীতি হিন্দু সমাজ কখনোই মেনে নেবে না।

মমতা ব্যানার্জি ২০১৫ সালে হজযাত্রায় মক্কার মিনাতে পদপিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় প্রাণ হারানো রাজ্যের হাজিদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছিলেন। তথ্য বলছে, ২০১৫ সালে মমতা ব্যানার্জি প্রাণ হারানো হাজিদের পরিবারে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছিলেন। এছাড়াও তিনি আহতদের জন্য ২ লক্ষ টাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন। তিনি সেদিন মক্কার মিনা শহরকে মৃত্যু শহর বলেননি।

মৃতদের পরিবারকে সাহায্য করেছেন এতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এই রাজ্যের যাঁরা কুম্ভমেলায় গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন তাঁদের কেন সাহায্য করছেন না? তারা হিন্দু বলেই কি তাঁর কাছে ব্রাত্য? তাহলে তিনি কীসের হিন্দু? কীসের ব্রাহ্মণ? আসলে তিনি একজন পক্ষপাতদুষ্ট ক্ষমতালোভী শাসকমাত্র। তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। ক্ষমতার জন্য তিনি সবকিছু করতে পারেন, এটাই হলো প্রকৃত সত্য।

মমতা ব্যানার্জির কথামতো পশ্চিমবঙ্গের সড়কগুলোকেও মৃত্যু সড়ক বলতে হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পশ্চিমবঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালে রাজ্যে ১৩,৬৮৬টি সড়ক দুর্ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে, যার ফলে ৬০০২ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২০২১ সালের তুলনায় দুর্ঘটনার সংখ্যা ১৪.৬৫ শতাংশ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৩.৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কই, তিনি তো রাজ্য সড়কগুলোকে যমদুয়ারের রাস্তা বলে অভিহিত করছেন না! সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে তাঁর হাসিমুখের বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপন রাজ্যের সর্বত্র শোভা পায়। তাতে কি সড়ক দুর্ঘটনা বন্ধ হয়েছে?

রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় ২০২৪ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শহরে ১৯১ জনের মৃত্যু হয়েছে যা ২০২৩ সালের ১৫৯ টি মৃত্যুর তুলনায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটি ২০১৬ সালের পর প্রথমবারের মতো বৃদ্ধি। গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর হার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় ৮.১২ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ৪.০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদিন এত মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কোনো প্রতিক্রিয়া শুনতে পাওয়া যায় না। বিষ মদ খেয়ে মৃত্যুর হার, শিশুমৃত্যুর হার, এসব দিকেও পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে নেই। তাই বলে পশ্চিবঙ্গকে কেউ যমপুরী বলে অভিহিত করছে না।

মমতা ব্যানার্জি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতাকে হুমকি দিয়েছেন, একশ্রেণীর মানুষ যদি রাস্তায় নামে তবে সামলানো যাবে তো? তিনি কাদের রাস্তায় নামার কথা বলেছেন সেটা রাজ্যের মানুষের বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি। তাঁর হাতে পুলিশ, তিনি মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ মন্ত্রী, তাহলে একশ্রেণীর মানুষ রাস্তায় নামলে কে সামলাবে?

রাস্তায় নামার অধিকার সবার আছে। হিন্দুরা যদি রাস্তায় নামে তাহলে তার কী অবস্থা হবে তা তাঁর ভেবে দেখা দরকার। তাঁর এই সাধের মুখ্যমন্ত্রিত্ব, সাধের চেয়ার কোথায় শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে তা তিনি বুঝতেও পারবেন না। সে জন্য কী বলছেন, তা বলার আগে তাঁকে দশবার ভাবা উচিত।

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

বৃন্দা কারাতের হিন্দুত্ব ব্যাখ্যান

এই পৃথিবীতে ডিএনএ বলে একটি বস্তু আছে। এ হলো জীবের আণবিক কাঠামো, যা তার বংশগত বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করে। আমাদের দেশে কমিউনিস্টদের ডিএনএ হিন্দুত্ব বিরোধিতার ক্রোমোজোম দিয়ে তৈরি। এরা জন্মলগ্ন থেকেই এই দেশ, এই দেশের সনাতন সংস্কৃতি, এই দেশের হিন্দুধর্ম, হিন্দুত্ব— এ সবের বিরুদ্ধে সর্বদা লড়াই করে চলেছে।

ক'দিন আগে শহর কলকাতায় সিপিআইএম দলের রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল। ওই সম্মেলনে কমিউনিস্ট নেত্রী বৃন্দা কারাত তাঁর লেখা একটি পুস্তকের আবরণ উন্মোচন করলেন। বইটির নাম 'হিন্দুত্বের হিংসার মুখে নারী'। বইটির শিরোনাম দেখে প্রথমে একটু অবাকই হয়েছিলাম। 'হিন্দুত্বের হিংসার মুখে নারী'! তার মানে তাঁর দৃষ্টিতে হিন্দুত্ব হলো নারী নির্যাতনের প্রতীক, হিন্দুধর্ম নারীদের ওপর শুধু অত্যাচারই করে। যে হিন্দুধর্মের গর্ভ হতে বৃন্দা কারাতের জন্ম, যে হিন্দুত্বের ভাবধারায় পুষ্ট পিতা-মাতা আদর করে তার শিশুকন্যার নাম রেখেছিলেন বৃন্দা— অর্থাৎ কৃষ্ণসঙ্গিনী শ্রীধারার সহচরীর নামে, যে হিন্দু-ভারতের জল-বায়ু, ফলে-ফুলে বৃন্দাদেবী লালিত পালিত হলেন, শিশু থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে বার্ধক্যে উপনীত হলেন— সেই বৃন্দাদেবী জীবনের শেষলগ্নে এসে হিন্দুধর্মকে গালাগালি দিয়ে বই লিখলেন। একে ডিএনএ-র গণ্ডগোল ছাড়া আর কিই-বা বলা যেতে পারে!

কমিউনিস্ট বোনম্যারো (অস্থি-মজ্জা) প্রতিনিয়ত এই বৃন্দা কারাটদের ধমনীতে সঞ্চার করে চলেছে হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষের বদ রক্ত। কিন্তু প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। এরপরেও কী একজন হিন্দু বাঙ্গালির সিপিএম নামক আলট্রা মুসলিম লিগ দলটার সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত? নাকি বাঙ্গালি নতুন করে ভাবতে শুরু করবে?

অবশ্য বৃন্দাদেবীই প্রথম নন। কমিউনিস্টরা জন্মগত হিন্দু বিদ্বেষী। আপনাদের মনে থাকবে ক'বছর আগে ওদেরই বিকাশ-সুবোধরা নিজেদের সেকুলার প্রমাণ করতে কলকাতায় রাস্তায় প্রকাশ্যে গোমাংস খেয়েছিলেন। না, কোনো শুয়োরের মাংস খাননি। তাতে কমিউনিস্টরা জন্মগত ভার্জিনিটি হারাতো। তাদের দেখাদেখি বৃন্দাদেবীও প্রতিযোগিতামূলক হিন্দু বিদ্বেষে নামলেন। তিনি একদিকে তাঁর বইতে হিন্দুদের হাতে নারীদের লাঞ্ছিত হওয়ার মনগড়া কল্পিত কাহিনি খাড়া করলেন। আর উলটোদিকে কত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়গুলির নারী বিদ্বেষের ব্যাখ্যানগুলি ভুলে গেলেন। তিনি ভুলে গেলেন এদেশে হাজার বছর ধরে ইসলামি শাসকদের হারেমে বন্দি লাখো হিন্দুরমণীর আর্তচিৎকার। ভুলে গেলেন তথাকথিত মহামতি আকবরের তৈরি নারী কেনা-বেচার জন্য তৈরি 'মিনাবাজার', আর তার পাঁচ হাজার রাজপুত রমণী দিয়ে সাজানো হারেমের গল্প। ভুলে গেলেন অত্যাচারী

জেহাদিদের থেকে বাঁচতে রানি পদ্মিনীর ১৪ হাজার রমণীকে নিয়ে জহরব্রত পালনের হৃদয় বিদারক উপাখ্যান। ভুলে গেলেন ১৯৪৬/৪৭-এর দেশভাগ কালে মুসলিম লিগের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের কথা, নোয়াখালি ও কলকাতার বুকে হাজার হাজার হিন্দুনারীর বলাৎকারের ঘটনা। ভুলে গেলেন ১৯৭১-এর ভারত- পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানের মেজর জেনারেল নিয়াজির 'বাঙ্গালি হিন্দু মেয়েদের পেটে ইসলামের বীজ ঢুকিয়ে দাও' উক্তির কথা, যার ফলশ্রুতিতে কুড়ি লক্ষেরও বেশি হিন্দু নারী সেদিন ধর্ষিতা হয়েছিলেন। চেপে গেলেন ১৯৯০ সালে কাশ্মীরে ইসলামি জেহাদিদের দ্বারা শত শত হিন্দুরমণীর উলঙ্গ প্যারেড আর রাতভর বলাৎকারের কাহিনি। ভুলে গেলেন ২০০১ সালে বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে নাবালিকা পূর্ণিমা শীলের মায়ের অসহায় আকুতি— 'তোমরা এক এক করে যাও বাবা, আমার মেয়েটা যে বড্ডো ছোটো'। এমনকী ভুলে গেলেন বর্তমান বাংলাদেশে ঘটে চলা হিন্দুনারীদের উপর জেহাদি তাণ্ডবের করুণ কাহিনিও।

যে খ্রিস্টান সম্প্রদায় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নারীর শরীরে আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করত না, যারা চার্চের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য ১৯ বর্ষীয়া কন্যা 'জোয়ান অব আর্ক'কে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল, যারা ১৯০ বছর ধরে এদেশের স্বাধীনতাকামী নারীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে, আমাদের ঘরের মায়েদের শরীর নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে--- বৃন্দাদেবী সে সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা খুঁজে পেলেন না। আবার অন্য একটি সম্প্রদায়, যারা ১২/১৩ বছরের শিশুকন্যার বিবাহকে ধর্মীয় মান্যতা দিল, নিকাহ হালালার নামে নারীত্বের চরম অবমাননা করল, নারীকে ভোগ্যবস্তু হিসেবে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখল, 'নারী তোমার শস্যক্ষেত্র' বলে তাকে কেবল যৌন ইচ্ছাপূরণের যন্ত্র বলল— বৃন্দাদেবী তাদের মধ্যে নারী বিদ্বেষের লেশমাত্র খুঁজে পেলেন না। ধন্য বৃন্দাদেবীর দৃষ্টি! আর যে ধর্ম সৃষ্টির ঊষাকাল থেকে নারীকে দেবী মেনেছে, মা-দুর্গা মা কালীকে শক্তির আধার রূপে পূজা করেছে, নদীকে মা বলেছে, গাভীকে মা বলেছে, বৃক্ষকে মা বলেছে, মাটিকে দেশমাতৃকা বলে সম্বোধন করেছে, সেই ধর্ম বৃন্দা কারাতের চোখে হয়ে গেল নারী বিদ্বেষী হিংসার ধর্ম? ধন্য বৃন্দা কারাত!

এদেশের হিন্দু সন্তরা বলেছেন, 'রাষ্ট্রস্য সুদৃঢ়া শক্তি, সমাজস্য চ ধারিণী, ভারতে সংস্কৃতে নারী, মাতা নারায়ণী সদা'— অর্থাৎ হিন্দু সমাজে শক্তির আধার হলেন নারী, তাই এদেশের নারী লক্ষ্মীরূপে পূজিতা হয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্বদেশমন্ত্রে বলেছেন, 'ভুলিও না, তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী। ...ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র'। বৃন্দা কারাত ঋষি বর্ণিত মহামায়ারূপী সেই হিন্দু সমাজকে নারী নির্যাতনকারী বলে দাগিয়ে দিলেন। এ কি তার অজ্ঞতা, না শয়তানি? তিনি কী জানেন না যে অন্যান্য সম্প্রদায় যেখানে পুরুষকেই কেবল দেবতা বলে মানে, সেখানে হিন্দুধর্ম পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম যেখানে নারীকেও দেবী হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে? যে বেদ হিন্দুধর্মের আকরগ্রন্থ সেই বেদের বহু শ্লোক রচনা করেছেন লোপামুদ্রা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, ঘোষা, অপালার মতো বিদুষীরা? 'মাতৃবৎ পরদারেষু'— পরস্ত্রী মায়ের সমান, এই ভাব এদেশেই জাগরিত হয়েছে, অন্য কোনো দেশে বা সম্প্রদায়ে তার প্রকাশ ঘটেনি?

তবে এদেশে হিন্দুত্ব যে নারীর রক্ষাকবচ, একমাত্র হিন্দুত্বই যে নারী স্বাধীনতার বিশ্বাসী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বৃন্দা কারাত নিজে। নাহলে এই কমরেড নারী এমন হিন্দু বিদ্বেষী বই লিখেও এমন বহাল তবিয়তে কলকাতার বুকে হাসি হাসি মুখে ফোটোসেশন করতে পারেন? মনে আছে ২০০৭ সালের ২১ নভেম্বরের ঘটনা? সেদিন এই কলকাতার বুকে ইসলাম অবমাননার মিথ্যা অপবাদে বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিনের উপর জেহাদিরা কী আক্রমণটাই না সংগঠিত করেছিল? 'অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ফোরাম' আগুন জ্বেলেছিল সারা কলকাতা জুড়ে। জেহাদি আক্রমণ রুখতে সেদিন সেনা মোতায়েন করতে বাধ্য হয়েছিল সিপিএম সরকার। অবশেষে তসলিমাকে এক কাপড়ে কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল। তাহলে বলুন কে বেশি অসহিষ্ণু, হিন্দুরা না অন্যরা? তবুও কমিউনিস্টরা হিন্দুদের নারী বিদ্বেষী বলবেন। কারণ হিন্দুরা ঘুমিয়ে আছে। তারা জানেন হিন্দুরা কুম্ভে ডুব দিতে পারে, তারকেশ্বরে বাবার মাথায় জল ঢালতে পারে, তারাপীঠ গিয়ে মা মা করে চিৎকার করতে পারে, কিন্তু তাদের ধর্ম কখনোই ভিন্ন মতবাদের মানুষের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার কথা ভাবতে পারে না। হিন্দুরা সহজ মাটি, তাই হিন্দু ধর্মকে নিয়ে যা খুশি লেখা যায়, যত খুশি বলা যায়। বলি ম্যাডাম, অন্য সম্প্রদায়কে নিয়ে এরকমই একটা বই লিখুন না— 'ইসলামি জেহাদিদের হিংসার মুখে নারী'। সিরিয়া থেকে বাংলাদেশ ঘটনার তো শেষ নেই। সাহস আছে? কারাট পরিবারকে আর বাড়ি থেকে বেরোতে হবে না। 'সর্ তন্ সে জুদা'র স্লোগান উঠে যাবে।

তবে কমিউনিস্টদের শিরায় শিরায় এত হিন্দু বিদ্বেষ কেন? আসলে কমিউনিস্টদের ডিএনএ-তেই লুকিয়ে আছে আসল রহস্য। কমিউনিস্ট বোনম্যারো (অস্থি-মজ্জা) প্রতিনিয়ত এই বৃন্দা কারাটদের ধমনীতে সঞ্চার করে চলেছে হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষের বদ রক্ত। কিন্তু প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। এরপরেও কী একজন হিন্দু বাঙ্গালির সিপিএম নামক আলট্রা মুসলিম লিগ দলটার সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত নাকি বাঙ্গালি নতুন করে ভাবতে শুরু করবে? □

With Best Compliments from -

A Well Wisher

বিশ্বমানবের কল্যাণে মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির আন্দোলন

প্রদীপ মারিক

'রাধার প্রেমের ঋণ, শোধ যাবে সেদিন, নবদ্বীপে যেদিন 'গৌর' হবেন হরি। সাধের গোলোক ত্যেজে, পথের কাঙাল সেজে, ধুলায় পড়ে ঠাকুর দেবেন গড়াগড়ি।।' শুধু নবদ্বীপ নয় ভারতেও শুধু নয়, সারা পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণের নামে পাগল হয়ে যায়। মধুর হরিনাম সকল মানুষের মধ্যে প্রচার করছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী, ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি দোলপূর্ণিমার রাতে নদীয়ার নবদ্বীপে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল এবং নবদ্বীপ ধামের বাসিন্দারা গঙ্গায় স্নান করার সময় বৈদিক মন্ত্র এবং ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করছিলেন। এই মন্ত্র উচ্চারণের ফলে বায়ুমণ্ডল আধ্যাত্মিক স্পন্দনে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং সেই শুভ মুহূর্তে আবির্ভূত হন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর পিতা-মাতা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার নবদ্বীপের অধিবাসী জগন্নাথ মিশ্র ও শচী দেবী। চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ওড়িশার জাজপুরের আদি বাসিন্দা। তাঁর পিতামহ মধুকর মিশ্র ওড়িশা থেকে বঙ্গে এসে বসতি স্থাপন করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হলেন শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখিত দর্শনের ভিত্তিতে ভক্তিযোগ ও ভাগবত দর্শনের একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা ও প্রচারক। সমাজ জীবন ও ধর্মজীবনের কলুষতা দূর করা এবং সমগ্র দেশে ভক্তির বন্যা বইয়ে দেবার জন্যে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। চৈতন্যদেবের পিতৃদত্ত নাম ছিল বিশ্বম্ভর মিশ্র। যুবক অবস্থায়ই তিনি ছিলেন স্বনামধন্য পণ্ডিত। তর্কশাস্ত্রে নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি ছিল অবিসংবাদিত। জপ ও শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ যে ছেলেবেলা থেকেই বজায় ছিল, তা জানা যায় তাঁর জীবনের নানা ঘটনা থেকে। কিন্তু তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ ও জ্ঞানার্জন। পিতার মৃত্যুর পর গয়ায় পিণ্ডদান করতে গিয়ে নিমাই তাঁর গুরু ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ পান। ঈশ্বরপুরীর নিকট তিনি গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হন। এই ঘটনা নিমাইয়ের পরবর্তী জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বঙ্গে প্রত্যাবর্তন করার পর পণ্ডিত থেকে ভক্তরূপে তাঁর অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন দেখে অদ্বৈত আচার্যের নেতৃত্বাধীন স্থানীয় বৈষ্ণব সমাজ আশ্চর্য হয়ে যান। অনতিবিলম্বে নিমাই নদীয়ার বৈষ্ণব সমাজের এক অগ্রণী নেতায় পরিণত হন।

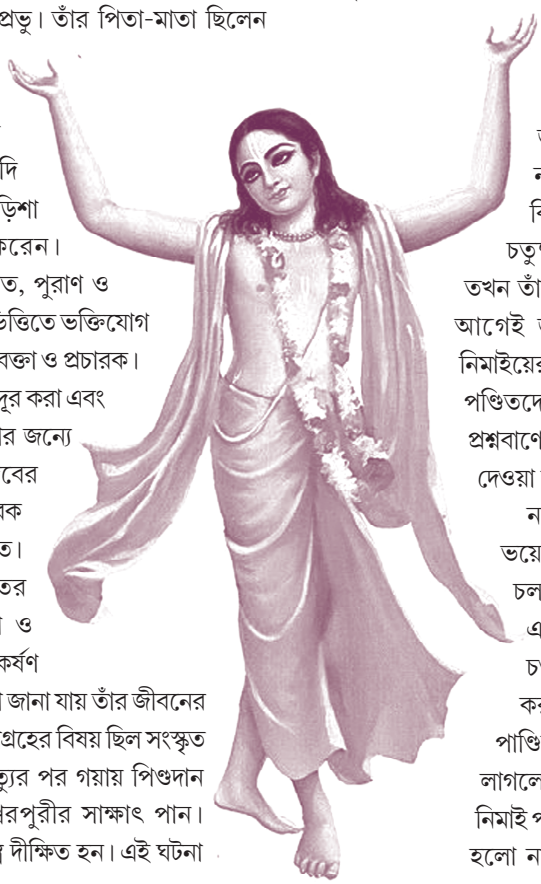

চৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট বাঙ্গালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার অবতার মনে করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীর ও গুণাবলীসম্পন্ন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্বকে শিখিয়ে গিয়েছেন শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রেম। রাধারানি হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। শ্রীরাধার অনুরূপ সদা-সর্বদা কৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন ও বিভোর হওয়ার কারণে মহাপ্রভুকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-সহ রাধাভাবেরও অবতার রূপে বর্ণনা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছিলেন ভাগবত পুরাণ ও ভগবদ্গীতা-য় উল্লিখিত দর্শনের ভিত্তিতে সৃষ্ট বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্বের এক জন বিশিষ্ট প্রবক্তা। তিনি বিশেষত রাধা ও কৃষ্ণ রূপে ঈশ্বরের পূজা প্রচার করেন এবং 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্রটি জনপ্রিয় করে তোলেন। সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষাষ্টক নামক প্রসিদ্ধ স্তোত্রটিও তাঁরই রচনা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতানুসারে, ভাগবত পুরাণের শেষের দিকের শ্লোকগুলিতে রাধারানির ভাবকান্তি সংবলিত শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য রূপে অবতার গ্রহণের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর গাত্রবর্ণ স্বর্ণালি আভাযুক্ত ছিল বলে তাঁকে গৌরাঙ্গ বা গৌর নামে অভিহিত করা হতো। অন্য দিকে নিম বৃক্ষের নীচে জন্ম বলে তাঁর নামকরণ হয়েছিল নিমাই।

ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী সাহিত্য বঙ্গ সন্তজীবনী ধারায় এক নতুন যুগের সূচনা ঘটিয়েছিল। গঙ্গাদাস, বিষ্ণুদাস ও সুদর্শন এই তিন পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীর পড়া যখন নিমাই শেষ করলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো বছর। কিছু বছর আগেই জগন্নাথ মিশ্র দেহত্যাগ করেছেন। নিমাইয়ের অসাধারণ প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তা। তাবড় পণ্ডিতদের সামনে নানা কূটপ্রশ্ন তুলে তাঁদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা, তাঁদের নিরুত্তর করে দেওয়া তখন তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। নবদ্বীপের নবীন ও প্রবীণ পণ্ডিতেরা তাঁর ভয়ে ভীত থাকতেন। সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। নবদ্বীপ শহরে মুকুন্দসঞ্জয় নামে একজন সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তার বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে নিমাই টোল খুলে অধ্যাপনা করতে বসলেন। নিমাইয়ের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে প্রচারিত হতে লাগলো। দূর দূর থেকে ছাত্ররা আসতে লাগলো নিমাই পণ্ডিতের টোলে। টোল জমে উঠতে দেরি হলো না। ধনী ও প্রতিপত্তিশালী নাগরিকদের

পৃষ্ঠপোষকতায় অচিরে নিমাই বেশ গণ্যমান্য হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণপ্রেমে, মহামন্ত্র হরিনামে তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন। নবদ্বীপের আইন শৃঙ্খলারভার তখন একজন মুসলমান কাজির হাতে। বৈষ্ণবদের কীর্তন নিয়ে এই মাতামাতি হই-হুল্লোড় তিনি ভালো চোখে দেখতেন না। তিনি ফতোয়া জারি করলেন নবদ্বীপে সমবেতভাবে কীর্তন করা চলবে না। নিমাইয়ের কাছে সংবাদ পৌঁছাল যে নবদ্বীপে সংঘটিত হয়েছে গোহত্যা। তাই শুনে নিমাই ক্রোধে রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। সেই দিনই তিনি হাজার হাজার ভক্ত নিয়ে শ্রীহরির নামগান করতে করতে পথে বেরোলেন। সারা শহর প্রদক্ষিণ করে অবশেষে কাজির বাড়িতে উপস্থিত হলেন। নিমাইয়ের সংগঠন শক্তির ভয়ে কাজি তাঁর আদেশ তুলে নিলেন। নবদ্বীপবাসী কৃষ্ণনামে পাগল হয়ে উঠলো। কৃষ্ণপাগলিনী রাধার মতোই নিমাইয়ের অন্তরাত্মায় কৃষ্ণ প্রেমের জোয়ার এল। বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য তাঁকে এই প্রেমভক্তির প্রবাহকে সঞ্চালিত করতে হবে। গৃহত্যাগ না করলে সেই বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দেওয়া যাবে না। তাই মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের এক রাতে নিমাই গৃহত্যাগ করলেন। ছুটে গেলেন কাটোয়ায়। সেখানে পণ্ডিত কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নিলেন। নিমাই তখন থেকে পরিচিত হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর। জাতিবর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে প্রেমের বাণী প্রচার করেছিলেন শ্রীচৈতন্য, এর বাইরে তিনি অন্য কোন ধর্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেননি। মানবীয় চেতনার পূর্ণবিকশিত, রূপবিগ্রহ ছিলেন তিনি। মানুষে মানুষে বিভেদ মুছে দেবার ব্রতই ছিল তাঁর জীবনসাধনা। সন্ন্যাসী হলেও তিনি আত্মমুক্তিকামী বা মানবতা বিমুখী ছিলেন না। সেই আকর্ষণেই হাজার হাজার মানুষ তার কাছে ছুটে আসত। হিন্দুধর্মের এক দুর্যোগপূর্ণ সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণ নামেই আবার হিন্দুত্বের জোয়ার আনলেন। তিনি সেই সময় প্রচার করেন, 'ঈশ্বরের আরাধনায় সকলের সমান অধিকার, প্রাণে ভক্তি নিয়ে ঈশ্বরকে ডাকলে তাকে পাওয়া যায়, ভক্তিতেই মুক্তি।' চব্বিশ বছর তিনি অতিবাহিত করেন জগন্নাথধাম পুরীতে। ওড়িশার সূর্যবংশীয় হিন্দু সম্রাট গজপতি মহারাজা প্রতাপরুদ্র দেব চৈতন্য মহাপ্রভুকে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ অবতার মনে করতেন। মহারাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেব ও তাঁর সংকীর্তন দলের পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হয়েছিলেন। ভক্তদের মতে, জীবনের শেষ পর্বে চৈতন্যদেব ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে হরিনাম সংকীর্তন করতেন এবং অধিকাংশ সময়েই ভাবসমাধিতে মগ্ন থাকতেন। সে যুগে একাধিক কবি চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (সবথেকে পুরনো এবং প্রমাণিত শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনচরিত্রাবলী), শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের— শ্রীমদ্ চৈতন্য ভাগবত এবং শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্তৃক প্রণীত চৈতন্যচরিতামৃত সাহিত্য ধারার প্রামাণ্য রচনা হিসেবে মর্যাদাময় আসনে অধিষ্ঠিত। গ্রন্থটিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের সংক্ষিপ্তসার বলা হয়। যার মধ্যে আছে চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, বিশেষ করে তার সন্ন্যাস জীবনের বছরগুলি এবং কীভাবে সেই জীবন ভক্তির আদর্শ হিসেবে উদাহরণে পরিণত হলো তার বৃত্তান্ত। চৈতন্যচরিতামৃত তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। আদি লীলা, মধ্য লীলা ও অন্ত্য লীলা। আদি লীলা রাধারানির (রাধাকৃষ্ণের যুগল অবতার) ভাব-সমন্বিত কৃষ্ণের অবতার হিসেবে শ্রীচৈতন্যের অনন্য ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ করেছে, তার নিকটতম শৈশব সহচর এবং তাদের পরম্পরা (অনুষঙ্গী উত্তরাধিকার) এবং তার ভক্তিমূলক সহযোগীদের বর্ণনা রয়েছে। মধ্য-লীলা চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের বিশদ বিবরণ, মাধবেন্দ্র পুরীর আখ্যান, অদ্বৈতবাদের পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে একটি দার্শনিক কথোপকথনের উল্লেখ রয়েছে। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের আদি নাম ছিল চৈতন্যমঙ্গল। কিন্তু পরে জানা যায় যে কবি লোচন দাসও এই নামের একটি চৈতন্যজীবনী রচনা করেছেন।

তখন বৈষ্ণব সমাজের গণ্যমান্য পণ্ডিতরা বৃন্দাবনে একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের গ্রন্থটির নাম হবে চৈতন্যভাগবত এবং লোচন দাসের গ্রন্থটি চৈতন্যমঙ্গল নামে পরিচিত। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মতো চৈতন্যভাগবত গ্রন্থেও চৈতন্য মহাপ্রভুকে কেবলমাত্র এক সাধারণ অবতার রূপে না দেখিয়ে ভগবানরূপী কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ অবতার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থকারের মতে, চৈতন্য অবতারের উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান কলিযুগের যুগ-ধর্ম (হরিনাম-সংকীর্তন) প্রবর্তনের মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণ। নিজ নাম প্রচার সম্পর্কে চৈতন্যদেব বলেছেন, 'পৃথিবীর যত আছে দেশ-গ্রাম। সর্বত্র সঞ্চারিত হবে মোর নাম।।'

চৈতন্যদেবের সত্যরূপ ও অবতারগ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-সমকালের ব্যাসদেব নামে পরিচিত। স্কন্দপুরাণে রয়েছে, 'অন্তঃকৃষ্ণো বহির্গৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদঃ। শচীগর্ভে সমাপ্নুয়াৎ মায়া মানুষ কর্মকৃৎ।।' অর্থাৎ ভগবান অন্তরে কৃষ্ণ এবং শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি দ্বারা বাহিরে গৌররূপ ধারণপূর্বক অঙ্গ (শ্রীনিত্যানন্দাদি), উপাঙ্গ (শ্রীঅদ্বৈতাদি), অস্ত্র (হরিনাম) ও পার্ষদ (শ্রীবাসাদি) সহ শচীগর্ভে প্রকটিত হয়ে মনুষ্য জাতির ন্যায় কর্ম করিবে। সৌরপুরাণে উল্লেখ রয়েছে, 'সুপূজিতঃ সদা গৌরঃ কৃষ্ণো বা বেদবিদ্ দ্বিজঃ।' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই বৈদিক ব্রাহ্মণ হয়ে বা শ্রীগৌরাঙ্গরূপে জগতে পূজিত হবেন। তাই আজকের দিনে সকলের কর্তব্য হচ্ছে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাসিক্ত হয়ে হরিনাম সাগরে অবগাহনের মাধ্যমে নিজেদের বিশুদ্ধ করে তোলা।

ষোড়শ শতাব্দীতে স্ব-উপলব্ধিসম্পন্ন মহাত্মা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী দ্বারা সংকলিত, মহাপ্রভুর অন্তর্নিহিত পরিচয় প্রকাশ করে, যা তাঁর সমস্ত অনুসারীদের দ্বারা গৃহীত হয়। ১৭টি খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটি থেকে মহাপ্রভুর পরম সত্য, পরম সত্তার সারমর্ম উপলব্ধি করা যায়। কবি কৃষ্ণদাস বলেছেন, 'উপনিষদগুলি যাকে নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করে তা হলো মহাপ্রভুর অতীন্দ্রিয় দেহের দীপ্তি এবং সমস্ত জীবের হৃদয়ে থাকা পরমাত্মা, তিনি পরব্রহ্ম স্বয়ং কৃষ্ণ, তিনিই পরম সত্য, পরতত্ত্ব এবং অন্য কোনো সত্য তাঁর চেয়ে বড়ো বা সমতুল্য নয়।' শ্রীরাধার বিরহ অভিসার এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেম সত্তার যুগল রূপ হলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি মধুর হরিনাম জগৎ সংসারে প্রত্যেক মানুষের অন্তরাত্মায় প্রবেশ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের শরণ ও স্মরণই কলি যুগের মানুষের পরম ভরসার জায়গা। □

বইমেলার আড়ালে

অজয় ভট্টাচার্য

কবিতার লাইনগুলোর দিকে অপলক তাকিয়ে ছিলেন ফটিকবাবু।

'গনগনে দুপুর নেমে এসেছে রাজপথে
দগদগে আলো ফোয়ারার মতো ফুঁসছে'।

চোখ গোল গোল করে ফটিকবাবু বললেন, 'মশাই করেছেন কী! কবিতার লাইনগুলো থেকে তো আগুন ঝরছে। আপনি এত সুন্দর কবিতা লেখেন, আগে জানতাম না তো! ফটিকবাবুর কথায় লজ্জা পেয়ে গেলেন অনিলবাবু। বললেন, 'সত্যি ভালো হয়েছে?'

—'ভালো হয়েছে মানে! একেবারে আগুনে লেখা। প্রকাশকরা পেলে লুফে নেবে। তা মশাই আর কাউকে দেখাননি তো?'

—'না, না। আপনিই প্রথম। আসলে কেমন লিখছি, তা তো বুঝতে পারছিলাম না। তাই লজ্জায় আর কাউকে দেখাতে পারিনি।'

—'লজ্জা! বলেন কী? এমন লেখার হাত যার, সে লজ্জা পাবে! লিখে যান। আরও লিখুন। আমি আমার চিফ এডিটরকে আজই বলে রাখছি। এই বইমেলাতেই আপনার কবিতার বই বেরিয়ে যাবে।'

উত্তেজনায় অনিলবাবুর সারা শরীর কাঁপতে শুরু করল। শরীরে বেশ খানিকটা অ্যাড্রিনালিন ঝরে পড়ল।

—'আরে দাঁড়িয়ে কেন, বসুন বসুন।'

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলেন অনিলবাবু। বললেন, 'সত্যি তো?'

—'সত্যি মানে, আপনি আমাকে চেনেন না মশাই। আমার কথায় কোম্পানির সব এডিটর ওঠে আর বসে। আজ যাঁদের নামিদামি লেখক হিসেবে দেখছেন, তাঁরা সবাই আমাকে ধরেই উঠে এসেছেন। সাধে কী ম্যানেজার বলেন যে, ফটিকবাবু আমাদের কোম্পানির লক্ষ্মী। ফি বছর বই মেলাতে আমার জন্য কোম্পানির কত টাকার ট্রানজাকশন হয় জানেন? শুনলে আপনি দাঁড়িয়ে পড়বেন। জাস্ট দাঁড়িয়ে পড়বেন।'

—'হ্যাঁ শুনেছি। এ লাইনে আপনার খুব নাম-ডাক। তার জন্যই তো আপনার কাছে এসেছি। ভাবলাম চেলাটেলা ধরে লাভ নেই। একেবারে গুরু ধরাই ভালো।'

—'বেশ করেছেন। তা আপনার এই কবিতার খাতাটা রেখে যান। আমি আজই এডিটরকে দেখিয়ে সব কথা পাকা করে রাখছি। তাছাড়া আপনি আরও দশ-পনেরোটা কবিতা লিখে ফেলুন। তাহলেই একটা কাব্যগ্রন্থ হয়ে যাবে। হাঁক পেড়ে বললেন কিগো শুনছো, অনিলবাবুর জন্য এক কাপ চা নিয়ে এসো।'

—'তাহলে আমি আবার কবে আসব?'

—'কবিতাগুলো লিখে শেষ করতে আপনার কতদিন লাগবে?'

—'বাড়িতে লেখার খুব ঝঞ্ঝাট। গিন্নি দেখলেই ঝামেলা করে। তাই ও ঘুমিয়ে পড়লে লিখতে শুরু করি।'

—'না না, খুব বেশি দেরি করার সময় নেই। একটা জাঁদরেল প্রচ্ছদ ঠিক করতে হবে। তাছাড়া কম্পোজ করা, প্রুফ দেখা— এসবের জন্য অনেক সময় লাগবে। বইমেলা শুরু হতে তো মাত্র দু'মাস বাকি। না পারলে, পরের বছর বইমেলাতে চেষ্টা করব।'

অনিলবাবু খপ করে ফটিকবাবুর হাতদুটো ধরে বললেন, 'না, এই বইমেলাতেই চেষ্টা করুন। আমি দিন পাঁচেকের মধ্যেই লেখা শেষ করে আসছি।'

ইতিমধ্যে ফটিকবাবুর স্ত্রী চা নিয়ে এলেন। ফটিকবাবু বললেন, 'কী গো চিনতে পারছে? ইনি হলেন অনিলবাবু। পাশের পাড়াতেই থাকেন। ইনি যে এত ভালো কবিতা লেখেন, আমরা জানতামই না! একেবারে ছাইচাপা আগুন।'

অনিলবাবু আবারও লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিলেন। বললেন, রিটায়ার করার পর এক বন্ধু বলেছিল, 'অনিল, তোর তো ভালো লেখার হাত। এই হলো মোক্ষম সময়। লিখে যা। জগতে এসেছিস যখন, একটা আঁচড় টেনে যা। তাই আবার লিখতে শুরু করেছি। এতদিন অফিস আর সংসারের চাপে লেখার ফুরসত পাইনি।'

ফটিকবাবুর স্ত্রী বললেন, 'আপনাকে দু-একবার রাস্তায় দেখেছি। তা শুনছিলাম আপনারা বাড়ি বিক্রি করে চলে যাচ্ছেন?'

—'হ্যাঁ, রিটায়ার করার পর থেকেই মেয়ে-জামাই খুব চাপাচাপি করছে, ওদের ওখানে চলে যেতে। ওদের কমপ্লেক্সেই একটি ছোটোখাটো ফ্ল্যাট পেয়ে গেলাম। বুড়ো-বুড়িকে শেষ বয়সে কে আর দেখবে। মেয়ে-জামাই ছাড়া তো আর কেউ নেই।'

ফটিকবাবু বললেন, 'যাওয়ার আগে আপনার কাব্যগ্রন্থ বেরিয়ে যাবে। তবে লেখা ছাড়বেন না। আপনার যা লেখার হাত, ওখানে গেলেও আপনি ভালো প্রকাশক পেয়ে যাবেন।'

—'কী যে বলেন! আপনি থাকতে আবার অন্য জায়গায় যাব কেন! লেখা হয়ে গেলেই আপনার কাছে চলে আসব। তাহলে আজ চলি। সকালে এখনও বাজার করা হয়নি। এরপর আরও দেরি হলে গিন্নি রাগ করবে।'

—'হ্যাঁ, আমারও আর সময় নেই। অফিসে যেতে হবে। এখন খুব কাজের চাপ। নতুন বই ছাপিয়ে দেওয়ার জন্য রোজই অফিসের সামনে লাইন পড়ছে।'

ফটিকবাবু একটি নামি প্রকাশক কোম্পানিতে চাকরি করেন। অনেক নবীন লেখকের তিনি হিল্লে করে দিয়েছেন। এ লাইনে তাঁর অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। আর অনিলবাবু সরকারি অফিসের বড়োবাবু ছিলেন। সদ্য রিটায়ার করেছেন। কলেজ জীবন থেকেই তাঁর লেখালেখির চর্চা ছিল।

ফটিকবাবুর বেঁধে দেওয়া সময়সীমার আগেই কবিতা লেখা শেষ করলেন অনিলবাবু। কবিতার খাতা নিয়ে সকাল সকাল পৌঁছে গেলেন ফটিকবাবুর বাড়ি।

ফটিকবাবু বললেন, 'দেখি তো কেমন লিখেছেন! বাঃ বাঃ, কী সুন্দর লাইন।

'পূর্ণিমা রাতে ধরায় আলোর রোশনাই।

ফুলের কুঁড়িরাও হয়ে ওঠে দ্বিগুণ সাহসী।'

মশাই আপনি তো লম্বা দৌড়ের ঘোড়া। আমার হাত দিয়ে যত কবি উঠে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে আপনিই সেরা।'

আনন্দের আতিশয্যে অনিলবাবুর সারা শরীর আবারও কাঁপতে শুরু করল। একটু স্বাভাবিক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই বইমেলাতেই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পাবে তো?'

—'প্রকাশ পাবে মানে, প্রথম কপি ছাপাখানায় চলে গেছে। আজ এই কবিতাগুলোও ছাপতে দেওয়া হবে। তবে আমাদের চিফ এডিটর বলছিলেন কিছু খরচ করলে বইটি ভালো কাটত।'

—'কাটত মানে?'

—'মানে হলো, আপনি তো নতুন কবি। বাজারে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। তাই আমরা নামকরা শিল্পী দিয়ে প্রচ্ছদ আঁকিয়ে নিচ্ছি। তাছাড়া উন্নত মানের ম্যাপল কাগজে কবিতাগুলো ছাপতে হবে। হার্ড কভারের বইয়ের আবেদন বেশি। তাই আপনার কাব্যগ্রন্থটি হার্ড কভারে প্রকাশ করা হবে। সব মিলিয়ে আপনাকে ত্রিশ হাজার টাকা দিতে হবে।'

টাকার অঙ্ক শুনে অনিলবাবু গভীর চিন্তায় পড়লেন।

—'আরে মশাই অত ভাবছেন কী?'

—'না, ভাবছি নাতনির জন্মদিনে কানপাশা দেব কীভাবে?'

—'মানে?'

—'মানে আমার গিন্নি কানপাশা কেনার জন্য যে টাকা রেখেছে, তা থেকে আপনাকে ত্রিশ হাজার দিয়ে দিলে কানপাশা কেনা হবে না।'

—'আরে মশাই, বইমেলাতে আপনার বইয়ের যে সেল হবে, তা দিয়ে আরও ভালো কানপাশা কিনে দিতে পারবেন।'

—'সত্যি?'

—'সত্যি মানে! তাও তো আমরা হার্ড কভারের জন্য চামড়া ব্যবহার করার কথা বলছি না। সেটা করতে পারলে বইটা বাজারে আরও কাটত। আর যদি আপনি রাজি না থাকেন, তবে বইটি সাধারণ বইয়ের মতোই প্রকাশ পাবে। তবে সেক্ষেত্রে দায়িত্ব আপনার।'

—'না না, আপনারা যেটা ভালো বুঝবেন, সেটাই করুন। টাকাটা আমি কালই দিয়ে যাব।'

—'ও ভালো কথা, আপনার বায়োডাটা দিয়ে যাবেন। মানে লেখক পরিচিতি। নতুন বইয়ের জন্য এটা ভীষণ প্রয়োজন। আর বইয়ের একটা ভালো নাম ঠিক করে আসবেন।'

—'বইয়ের নাম 'কানপাশা' রাখলে হয় না?

—'গুড আইডিয়া। কবিতার জগতে 'কানপাশা' নামটিতে বেশ নতুনত্ব আছে।'

বইমেলার প্রথম দিনই ফটিকবাবুর কথামতো অনিলবাবু বইমেলায় হাজির হলেন। অনিলবাবুকে একটি মঞ্চ দেখিয়ে ফটিকবাবু বললেন, 'আগামীকাল এখানেই আপনার বই প্রকাশের অনুষ্ঠান হবে। কলকাতার নামিদামি সাহিত্যিকরা উপস্থিত থাকবেন।' অনিলবাবুর কাছে সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। এরপর অনিলবাবুকে একটি বইয়ের স্টলে নিয়ে গিয়ে ফটিকবাবু বললেন, 'আমাদের কোম্পানির চিফ এডিটর মিস্টার ডি. রায়।'

অনিলবাবর সঙ্গে করমর্দন করে মিস্টার রায় বললেন, 'আপনার কবিতাগুলো সব উঁচু তারে বাঁধা। তবে আগামীতে যাতে আরও ভালো লিখতে পারেন, তার জন্য আপনাকে আরও ভালো ভালো কবিতার বই পড়তে হবে।'

এই বলে, একটি বড়ো ব্যাগে ঠেসে ঠেসে বই ভরতে লাগলেন। শেষে বললেন, বেশি না হাজার পাঁচেকের মতো দাম হবে। অনিলবাবু আঁতকে উঠলেন। বললেন, আমার কাছে অত টাকা নেই। এবার কেসটা হাতে নিলেন ফটিকবাবু। বললেন, 'মশাই নিয়ে যান। এখন না নিলে পরে পাবেন না। সব বিক্রি হয়ে যাবে। কাল সকালে টাকাটা আমার বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসবেন। আর আপনার কাব্যগ্রন্থের একটি কপি নিয়ে যাবেন। মূল অনুষ্ঠানের আগে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে সুবিধা হবে।'

অনিলবাবু আর কিছু বলতে পারলেন না। অবশেষে নিজের লেখা কাব্যগ্রন্থ হাতে পাবেন অনিলবাবু। আনন্দে রাতে ভালো ঘুমাতেও পারেননি। সকালে উঠে ছুটলেন ফটিকবাবুর বাড়ি। কড়কড়ে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দিলেন ফটিকবাবুর হাতে। তারপর কাব্যগ্রন্থের একটি কপি হাতে পেলেন। নতুন বইয়ের স্পর্শে অনিলবাবুর শরীরে বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল। রোমাঞ্চিত অনিলবাবু অপলক তাকিয়ে সোনালি রঙে লেখা 'কানপাশা' শব্দের দিকে। অপরূপ প্রচ্ছদ। ছবি হলেও যেন জীবন্ত। ঠিক যেমনটি ফটিকবাবু বলেছিলেন তেমনটি। বাড়ি ফিরে তাঁর হুঁশ হলো যে, এতবড়ো কাজের জন্য ফটিকবাবুকে একটু মিষ্টিমুখ করানো উচিত ছিল। দোকান থেকে মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে অনিলবাবু আবার এলেন ফটিকবাবুর বাড়ি। ঘরের ভেতর থেকে হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে। ফটিকবাবু তাঁর স্ত্রীকে বলছেন, অনিলবাবুর মতো দু-তিনটি মুরগি প্রতি বছরই জুটে যায়। কবিতার 'ক' বোঝে না, তার আবার কাব্যগ্রন্থের সখ। চকিতে অনিলবাবুর চোখ ঝাপসা হয়ে এল। সারা শরীর টলতে শুরু করল। হাতের মুষ্ঠি শিথিল হতে থাকল। এতক্ষণে পরম যত্নে ধরে রাখা 'কানপাশা' শিথিল মুষ্ঠি থেকে খসে পড়ল ফটিকবাবুর উঠোনে। □

ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

সত্যানন্দ গুহ

ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। বাঙ্গালির জীবনে ছিল দুর্দিনের ঘনঘটা। দিল্লি ও প্রাদেশিক শাসকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিবাদ ও ঈর্ষার ঘন মেঘ। মানুষের মধ্যে আদর্শগত বা ধর্মীয় ঐক্য প্রায় ছিলই না। বিধর্মী শাসক, মোল্লা-মৌলভি ও জেহাদিদের অত্যাচারে হিন্দুরা ভীত সন্ত্রস্ত। অত্যাচার যখন চরমে ওঠে তখন ধর্মান্তর ছাড়া অন্যপথ পায় না হিন্দুরা। মুসলমানের স্পর্শদোষ ঘটলে হিন্দুদের সমাজচ্যুত হতে বাধ্য করা হতো। উপনিষদের সাম্য, মৈত্রী ও ঐক্য শুধু পুস্তকে আবদ্ধ থাকল। এক শ্রেণীর পণ্ডিতম্মন্য তথাকথিত ব্রাহ্মণ এই মানুষদের হিন্দুসমাজ থেকে বহিষ্কার করে দিত বা একঘরে করে রাখত। হিন্দু নামধারী এই সমাজপতিদের চূড়ান্ত অসদাচরণের ফলে একশ্রেণীর বৌদ্ধ ও হিন্দু মুসলমান হয়ে গেল। মুসলমান হলে উচ্চপদ লাভ হবে এবং হিন্দুদের ঘৃণাও সহ্য করতে হবে না। এরাই আবার ধর্মান্তরিত হয়ে রাজানুগ্রহে পুষ্ট হয়ে হিন্দু ও হিন্দু কৃষ্টিকে ধ্বংস করতে লাগলো।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও চলছিল অনাচার। নানা প্রকার গীত, মনসার গান, শীতলামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, বিষহরির পাঁচালী, শিবের ছড়া, ডাক ও খনার বচন এবং লৌকিক সাহিত্যের আখ্যানকে নানাভাবে বিকৃত করে সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায়। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতিরও বিকৃত ব্যাখ্যা হতে শুরু করে। তৎকালীন কিছু সাহিত্য ছিল আদিরসাত্মক।

কিন্তু নবদ্বীপ ছিল বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান। এখানকার তকমা না থাকলে সেরা বিদ্বানের শিরোপা কেউ পেতেন না। সে যুগের, সে কালের সেরা পণ্ডিত ছিলেন নিমাই ঠাকুর। ব্যক্তিত্বে, অসাধারণ চরিত্রে বিমণ্ডিত। সরস্বতীর বরপুত্র, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, অবতার পুরুষ, পুরুষোত্তম, বৈষ্ণবমত প্রচারক, দেবতাকৃত নামেই তাকে অভিহিত করা হয়। ভগবান বুদ্ধের অহিংসা, মৈত্রী, শ্রীশ্রী আদি শঙ্করের নির্বিশেষ-ব্রহ্মদার্শনিক মায়াতত্ত্ব চৈতন্যদেবের নামতত্ত্বে যেন লীন হয়। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায়, প্রেম একবার মাত্র পৃথিবীতে রূপ গ্রহণ করেছিল, তা বঙ্গদেশে। এই মানব যৌবনে মহামানব, সন্ন্যাস গ্রহণের পর অতিমানব ও লীলাচলে লোকোত্তর মানবরূপে পরিগণিত হন। তিনি মাতা শচীদেবীর কাছে 'নিমাই'; পিতা জগন্নাথ মিশ্রের কাছে 'বিশ্বম্ভর'; গৌড়ীয়দের 'গোরাচাঁদ'; বৈষ্ণবদের 'শ্রীচৈতন্য' এবং বিশ্ববাসীর কাছে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' রূপে চিহ্নিত হলেন। এই লোকোত্তর জাদুকরের স্পর্শে সারা ভারতে ভাষা, সাহিত্য, নাটক, নৃত্যকলা, সংগীত, দর্শন ও ধর্ম এক দিব্য নব চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। নবদ্বীপের প্রেমাগ্নিতে ভারত তথা বিশ্ব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রেমধর্মে মাতোয়ারা হয় মানুষ।

বৌদ্ধযুগের শেষপর্বে অবক্ষয় ও অন্ধকারের প্রথম পদপাত। কিছু বৌদ্ধমঠ ও

যোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যদেব বাঙ্গালির সমাজ, চরিত্র, সাহিত্য ও জীবনযাত্রায় এক নবচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটান এবং বাঙ্গালির মানস জগৎকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেন। অধ্যাত্ম সাধনাতেও সেই প্রভাব ছিল অপরিসীম। জড়তায় আক্রান্ত সমাজজীবনকে তিনি করে তোলেন গতিশীল। ধর্মীয় চেতনার অবক্ষয়, তামসিকতা, কপটতার অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোয় নিয়ে আসেন। প্রাক্ চৈতন্যযুগে আচারসর্বস্বতা মানুষের মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। ধার্মিক মানুষেরা জাঁকজমকপূর্ণভাবে বিভিন্ন পূজা-পার্বণের অনুষ্ঠান আর তীর্থ ভ্রমণের ব্যয়বহুল, আড়ম্বরপূর্ণ বাহ্যিকতাকেই ধর্মসাধনা বলে মনে করতেন। তাঁদের পূজা পর্যবসিত হতো কেবলমাত্র উৎসবে।

প্রাক-চৈতন্যযুগে বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রম ব্যবস্থায় বিপথগামিতা আসে। সমাজের অধঃপতন ও অবক্ষয় চরম সীমায় পৌঁছায়। বঙ্গীয় ক্ষত্রিয়কুলের একাংশ তুর্কি শাসন স্বীকার করে নামমাত্র 'রাজা' উপাধিধারী ছিলেন। প্রজার স্বার্থরক্ষায় তারা ছিলেন অসমর্থ। পালযুগে এক শ্রেণীর বৈশ্য বৌদ্ধ ও নাস্তিক হয়ে উঠলেও পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে শৈব ও শাক্ত পরম্পরার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রশাসক যবন শ্রেণীর তরফে সমাজের শূদ্র ও অন্ত্যজদের বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার পাশাপাশি তরোয়ালের জোরে চলছিল ব্যাপক ধর্মান্তরণ। হরিনদী গ্রামের দুর্জন ব্যক্তি (চৈঃ ভাঃ - ১৬/২৬৭), গোপাল চক্রবর্তী (চৈঃ চঃ ৩/১৮৮) ও ব্রহ্মবন্ধু রামচন্দ্র খাঁ (চৈঃ চঃ ৩/১০১) ছিল পাষণ্ড ও দুষ্কৃতী। পরবর্তীকালে এই দুর্জন সমাজপতিই নিমাইপণ্ডিতের বিরুদ্ধে কাজির কাছে নালিশ জানায়। তারা হরিসংকীর্তন বন্ধ করে নিমাইকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে বলে। নিমাই হিন্দুধর্ম নষ্ট করছেন বলে অভিযোগ করে। কীর্তনের শব্দে ঘুম হচ্ছে না, দেশের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে, জাতপাত যাচ্ছে— কাজির কাছে এমনি বহু নালিশ করা হয় (চৈঃ ভাঃ ১৭/২০৩-২১)।

প্রাক্‌চৈতন্যযুগ ও চৈতন্যযুগের প্রথমার্ধ

সংঘারাম তন্ত্রের বিকৃতি ঘটিয়ে নানা বিকৃত চর্চা ও পিশাচ সাধনার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তুর্কি-তাতারদের আক্রমণে, পাঠান ও মুঘলদের শাসনে সমাজজীবনে ঘোর অন্ধকার নেমে আসে। আর্ত-লাঞ্ছিত- দুঃস্থ-দুঃখী ও ধর্মপিপাসু মানুষদের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এক উজ্জ্বল উদাত্ত মানবতার বার্তা নিয়ে এলেন। দেশ ও জাতি উদ্বুদ্ধ হলো। তাঁর স্পর্শে নবজাগরণের সূত্রপাত হলো।

শ্রীচৈতন্যদেব মানুষকে নিরাসক্ত জীবনযাপন ত্যাগের দীক্ষা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আজও ভারতের কিছু এলাকা জাতপাতের দ্বন্দ্বে দীর্ণ। সরকার কঠোর আইন প্রয়োগ করেও ব্যর্থ। চৈতন্যদেব প্রেম ভালোবাসা দিয়ে জাতবর্ণ নির্বিশেষে সকলকে আকর্ষণ করেন। দেশ, জাতি, সমাজকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁর সংকীর্তনের দলে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবার সমান অধিকার ছিল। বিশ্বময় সাম্য চেতনার তিনিই প্রবক্তা। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে যা মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

হরিদাস ঠাকুর অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গলাভ ও মন্দিরে প্রবেশ নিয়ে তাঁর মনে সংশয় ছিল। 'হরিদাস কহে আমি নীচ জাতি ছার। মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার।। হরিদাস কহে প্রভু, না ছুঁইও মোরে। মুই নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে।।'

চৈতন্যদেব তাঁকে শুধু তাঁর কোলেই স্থান দিলেন না, বুকে টেনে নিয়ে ভক্তদের কাছে তাঁর প্রশংসায় মুখর হলেন এমনকী হরিদাসের দেহত্যাগের পর হরিদাসের মৃতদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা করেন এবং সমাধিতে নিজ হাতে মাটি দেন। ভক্তদের মালা-চন্দন পরিয়ে আকণ্ঠ ভোজন করালেন এবং বললেন ''হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি। তাঁহা বিনা রত্ন শূন্যা হৈলা মেদিনী।।''

সে সময় নালন্দা, বিক্রমশীলার মতো নবদ্বীপ ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান, কিন্তু সেই জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র ছিল শুষ্ক, আধ্যাত্মিক ভাব বর্জিত। তর্ক করে এবং তর্কযুদ্ধে জিতে পাণ্ডিত্য প্রকাশই ছিল মুখ্য বিষয়। শিক্ষিত সমাজ ছিল নাস্তিক বা সর্বেশ্বরবাদী। শ্রীচৈতন্যদেব সেখানেও কঠোর আঘাত হানেন এবং সঠিক পথের সন্ধান দেন। জড়তার নাগপাশ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে যেমন নেতৃত্বের প্রয়োজন তিনি তেমন নেতৃত্বই দিয়েছেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন বিবেকবোধ-বর্জিত অচলায়তনকে তিনি তমসা মুক্ত করে গতিশীল করেছিলেন, যার ফলশ্রুতি আজকের বাঙ্গালি ও বাংলাভাষা। প্রেমভক্তিতে চণ্ডালের জিহ্বাগ্রে কৃষ্ণনামের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় (১৮৯৪), 'একবার মাত্র এক মহতী প্রতিভা সেই অবিচ্ছিন্ন অবিচ্ছেদক জাল ছেদন করে উত্থিত হয়েছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একবার মাত্র বঙ্গের আধ্যাত্মিক তন্দ্রা ভেঙ্গেছিল। কিছুদিনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের ধর্ম জীবনের সহযোগী হয়েছিল।'

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান অবদান : শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলে প্রচার করা। সর্বসাধারণের সঙ্গে নাম সংকীর্তন প্রচার। জাতিভেদ প্রথা বর্জন। অহিংসা, সর্বজনপ্রীতি ও বিনয়। তাছাড়া--- (ক) শ্রীশ্রী আদি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈততত্ত্ব তথা ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যার সরলীকরণ করে ভক্তিমূলক বেদান্ত দর্শনের প্রচার। মহাপ্রভু দশনামি পরম্পরার অন্তর্গত সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর মন্ত্রগুরু ছিলেন স্বামী ঈশ্বর পুরী এবং সন্ন্যাস গুরু ছিলেন স্বামী কেশব ভারতী। (খ) বৈষ্ণব পদাবলীর অবতার তত্ত্ব। (গ) নতুন ভাষা ও সাহিত্য (ব্রজবুলি) বিস্তার লাভ। (ঘ) বাঙ্গালির ভাবজীবনে নবজাগৃতির সূত্রপাত, (ঙ) শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মের জগতে বন্যা ডেকে আনেন। ভারতীয় জীবনে 'শ্রী' ও 'চৈতন্য' ফিরিয়ে আনেন। (চ) মানুষের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি, নতুনের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলেন। (ছ) বিগ্রহ পূজা বিরোধী যবন শাসকদের আক্রমণে সমাজের সর্বস্তরে ভাঙন ও সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়। সব অপসংস্কৃতি দূর করে ধর্মীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনে দিব্য প্রেরণা দেন মহাপ্রভু। (জ) মথুরা বৃন্দাবন ও লুপ্ত তীর্থগুলির পুনরুদ্ধার। (ঝ) জনজীবনে নবজাগরণ ও সংস্কৃতির চেতনার উন্মেষ। (ঞ) শ্রীভগবানের নাম ও শ্রীভগবানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' অর্থাৎ শ্রীভগবানের গুণকীর্তনের প্রতি গুরুত্ব দেন। (ট) শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম। বিশ্বের তিনি উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। সকল জীবের প্রতি মানদানকারী— এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

(ঠ) ১৫১০ সালে ২৪ বৎসরের যুবক চৈতন্যদেব কাজির কাছে দাবি আদায়ের যে পদযাত্রা করেছিলেন তা এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ পথ অনুসরণ করেন। সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য, প্রেম, অহিংসা ও সংহতির এই এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। (ড) সর্বধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অগাধ। ধর্মের ভেদাভেদ ও কণ্টকিত সংকীর্ণতাকে এক পদানুবর্তী করতে চেয়েছিলেন। (ঢ) হিন্দুসমাজের প্রতি মুসলমানদের অসম্মানজনক আচরণ চৈতন্যদেবের সর্বজনীন প্রেমের দ্বারা কিছুকাল স্তিমিত ছিল। (ণ) রাধাকৃষ্ণের প্রেম নিয়ে একশ্রেণীর কবি ও পুরাণবিদ যে দেহজ, কামজ ব্যাখ্যা করেছিলেন তা চৈতন্যদেবের স্পর্শে আদিরসবিবর্জিত, অনাদিরসাত্মক অতি উচ্চাঙ্গের বৈষ্ণবমতে প্রবর্তিত হয়। (ত) সর্বজাতির জন্য ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্রের অধিকারদান করেন। বিপথগামী, পতনোন্মুখ, অবক্ষয়ধর্মী দুর্নীতিতে সমাজের বুকে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করতে সমর্থ হন। (থ) বাংলা ভাষায় জীবনী লেখার সূত্রপাত হয়। (দ) বঙ্গপ্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। (ধ) প্রবল প্রেমধর্মের জোয়ারে হিন্দুত্ববোধ সচল হয়ে ওঠে। একথা জোর গলায় বলা যায় শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মধ্যযুগের বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণপুরুষ। জাতির চরমতম অন্ধকার দিনে তাঁর আবির্ভাব। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, প্রভৃতি অন্যায়-অপসংস্কৃতি, বিকৃতি হতে বলিষ্ঠ বনস্পতির মতো বঙ্গ সমাজকে রক্ষা করেন। দুর্নীতি, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা, হীন স্বার্থপরতা যখন জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করে দিয়েছিল, তখন এমনই এক নেতৃত্বের প্রবল প্রয়োজন ছিল। তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব আসমুদ্রহিমাচলে প্রবলভাবে নাড়া দেয়।

সব বিষয়ে তিনি নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন। □

রঙে রঙে সংহতির জাতীয় উৎসব

নন্দলাল ভট্টাচার্য

বহিরঙ্গে সবই এক

এ এক নিত্য আবর্তন। সৌরমণ্ডলে সূর্যকে ঘিরে রয়েছে গ্রহ-নক্ষত্র। ঋতুচক্রেও এমনই এক কেন্দ্র ঘিরে পাক খায় তিনটি শব্দ— দোল, দোলযাত্রা, দোল-উৎসব। বহিরঙ্গে অর্থ এক, অন্তরঙ্গে রয়েছে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য। সে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে 'যাত্রা' এবং 'উৎসব' শব্দ দুটি দোলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। দোলযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পূজা-অর্চনা— এক অর্থে পরমার্থের সাধনা।

অন্যদিকে দোল-উৎসব সম্পূর্ণভাবেই এক পার্থিব ভাবনা থেকে জাত। এই ভাবনা বা আকাঙ্ক্ষা হলো মিলনের। একের সঙ্গে বহুর। রঙের স্পর্শে সমাজের সকলের একীভূত হওয়ার, সামাজিক বৈষম্য ভুলে মিলেমিশে একাকার হওয়ার, এক বিশ্বজনীন আনন্দে মেতে ওঠার অনুষ্ঠান দোল।

দোলযাত্রা যদি হয় আত্মস্থ হওয়ার সাধনা, তাহলে দোল উৎসব উল্লসিত হওয়ার, নিজেকে বাইরে আনার প্রয়াস। এই প্রয়াসে শামিল করা হয় আরাধ্যকেও। আর তাই যে দেবতাকে নিত্যদিন পূজা করা হয় গৃহের অভ্যন্তরে, মন্দিরে— এদিন তাঁকে নিয়ে আসা হয় বাইরে— স্থাপন করা হয় দোলমঞ্চে। দেবতা এদিন ঠাঁই নেন সকলের মধ্যে। ভিতর বাহির তখন এক। প্রভেদের সব আবরণ যায় খসে। আর সে কারণেই দোল ভারতীয় জীবনের এক অনন্য অনুষ্ঠান। কোনো অঞ্চল বা কোনো গোষ্ঠী নয়, দেশ জুড়ে সকলকে নিয়ে এমন অনুষ্ঠানের নজির ভারত কেন বিশ্বের আর কোথাও আছে বলে জানা যায় না।

দোল আর হোলি আলাদা নয়, পুরো এক

দোলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও একটি শব্দ— হোলি বা হোরি। একই সময়ে প্রায় একই দিনে একইভাবে পালিত হয় দোল ও হোলি। আঙ্গিকে দোল ও হোলি একই। কিন্তু ব্যুৎপত্তির দিক থেকে দু'টি অনেকটাই আলাদা।

প্রথমত, দোল হয় ফাল্গুনের পূর্ণিমায়, অন্যদিকে হোলির অনুষ্ঠান হয় পূর্ণিমার পর দিন। ক্বচিৎ কখনো দোল আর হোলি পালিত হয় একই দিনে। দোল যদি হয় বাঙ্গালির উৎসব, তাহলে হোলি হলো অবাঙ্গালিদের উৎসব।

দোল একটি বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব। অনুষ্ঠানের কেন্দ্রে রয়েছেন রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ। দোল হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার একটি অঙ্গ। বৃন্দাবনে লীলায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বালক বয়সের একটি খেলারই রূপ হলো দোল। দোল দ্বাপর যুগে বিষ্ণুর অষ্টম অবতারের একটি লীলা।

অন্যদিকে হোলির কেন্দ্রে রয়েছেন বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার নরসিংহ বা নৃসিংহদেব এবং ভক্ত প্রহ্লাদ। সত্যযুগে প্রকাশ পেয়েছিল বিষ্ণুর এই লীলা। সেদিক থেকে হোলি হলো দোলের চেয়ে অনেক প্রাচীন। কিন্তু ব্যাপকতায় দোলই প্রাধান্য ফেলেছে অনেকটাই এই হোলির ওপর। দুই -ই রঙের খেলা। দুয়ের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে বসন্ত ঋতুর রঙের বাহার। দুয়ের মূলেই প্রাচীন মদনোৎসবের ছায়া ঘন হয়ে জড়িয়ে রয়েছে।

প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ

দোল অথবা হোলি, যে নামেই ডাকা হোক, উৎসবটা রঙের। প্রেমের। বিশ্বাসের। অশুভের উপর শুভের জয়ে আনন্দ-উল্লাসের। রাধাকৃষ্ণের দেহাতীত প্রেম স্মরণে দোলে মেতে ওঠে সকলে রঙে রঙে। রঙের খেলায় উচ্ছ্বাসের আনন্দঘন চেহারাটা মাঝে মাঝেই সবকিছু ছাপিয়ে উঠলেও দোলযাত্রা প্রকৃতপক্ষে

আত্মমগ্নতার এক মৌনমুখর ভাস্বর প্রকাশ। দোল হলো নির্মল ভক্তির এক স্রোতস্বিনী— শান্ত সমাহিত জীবনকাহিনির প্রতিচ্ছবি।

অন্যদিকে হোলি হলো ভারতীয় জীবনবোধ এবং জাতীয় ঐক্য সংহতির এক উচ্চকিত রূপ। দোল প্রেমের আবির-গুলালে রাঙানো জীবনের মহত্তম কিছু মুহূর্তে দেবতাদের নিয়ে গীতমুখর শোভাযাত্রা। হোলি হলো অশুভের বিনাশে শুভের প্রতিষ্ঠায় আগুন জ্বালিয়ে রঙে রঙে আকাশ-বাতাস রাঙানোর অনুষ্ঠান। দেশে এক আত্মিক মিলনের মহাকাব্য। ওদিকে হোলি হলো বৃহতের সঙ্গে মিলনের, সমস্ত ভারতবাসীকে একই সূত্রে বেঁধে উন্নত জীবনবোধে মুখর হওয়ার খেলা।

রঙের অন্তরঙ্গতায় আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনের পথে এগিয়ে যাওয়ার এক আন্তরিক ভক্তি-সাধনা। অন্যদিকে জীবন ও ঐক্যের এক আনন্দময় উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান হলো হোলি। হোলি অন্য কথায় শাশ্বত ভারতের এক ঐক্যবদ্ধ রূপ কল্পনার প্রতিরূপ।

হোলির আগে হোলিকা দহন

দোল ও হোলি— দুটিই মূলত বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠান। দুটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দশাবতারের কাহিনি। বয়সের দিক থেকে হোলিই অগ্রজ, তার উদ্ভব ঘটেছিল সত্যযুগের একটি ঘটনা থেকে।

সত্যযুগে দৈত্যকুলের অধিপতি হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার বরাহ নিহত করে হিরণ্যাক্ষকে। আর তাতেই তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন হিরণ্যকশিপু। বিষ্ণুর নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারেন না হিরণ্যকশিপু। দৈত্যরাজ্যে নিষিদ্ধ হয় বিষ্ণুর পূজাতো বটেই, সেই সঙ্গে তাঁর নাম করাও হয় নিষিদ্ধ।

কিন্তু সরষের মধ্যে ভূত থাকাটাই বোধহয় প্রকৃতির নিয়ম। তাই সকলে যখন হিরণ্যকশিপুর ভয়ে তটস্থ; সেই সময় দৈত্যরাজপুত্র প্রহ্লাদ হয়ে ওঠে পরম বিষ্ণুভক্ত। নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে পর্যন্ত হরিনাম জপ। হিরণ্যকশিপুর চোখে এটা হলো চরম অধঃপতন। তাই শুরু হয় প্রচণ্ড শাসন। কিন্তু কোনোভাবেই পুত্রকে বিষ্ণুর আরাধনা থেকে বিরত করতে না পেরে শেষপর্যন্ত পুত্রকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন হিরণ্যকশিপু।

সিদ্ধান্ত নিলেও সেটা কার্যকর করাটা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ে তাঁর পক্ষে। কোনোভাবেই মারতে পারেন না প্রহ্লাদকে। প্রতিক্ষেত্রেই তার আরাধ্য বিষ্ণুর কৃপায় অক্ষত থাকে প্রহ্লাদ। খড়্গাঘাতে, বিষ প্রয়োগে, পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে, হাতির পায়ের তলায় ফেলেও প্রহ্লাদকে বধ করতে না পেরে হিরণ্যকশিপু শেষে যান তার এক বোন হোলিকার কাছে।

হোলিকা সাধনা করে ব্রহ্মার বর পেয়েছিল অন্যের ক্ষতি করার জন্য এই বরদান ব্যবহৃত না হলে আগুনে পুড়েও হবে না তার মৃত্যু। বিভিন্ন পুরাণের কথায় রয়েছে, হোলিকা এরজন্য পেয়েছিল এক বিশেষ চাদর। সেটি গায়ে দিলে আগুনও তাকে স্পর্শ করবে না। বোনের এই বরপ্রাপ্তির কথা জানতেন বলেই হিরণ্যকশিপু তার সাহায্য চান। প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে বসতে বলেন তাঁকে।

দাদার কথার রাজি হয় হোলিকা। প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে বসেন তিনি সাজানো চিতায়। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। সে আগুনে প্রহ্লাদের মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু সেই নিশ্চিত ব্যাপারটাই হয় অনিশ্চিত। আর তার জন্য শোনা যায় দুটি কাহিনি।

প্রথম কাহিনিতে আগুন জ্বলে উঠতেই হোলিকার মধ্যে জেগে ওঠে মাতৃহৃদয়। সরল শিশুকে বাঁচাবার জন্য হোলিকা তখন নিজের সেই চাদরটি খুলে প্রহ্লাদের গায়ে জড়িয়ে দেন। ফলে মৃত্যু হয় হোলিকার। বেঁচে যায় প্রহ্লাদ।

অন্য কাহিনি হলো, আগুন জ্বলে উঠতেই শ্রীবিষ্ণুর ইঙ্গিতে বইতে থাকে বাতাস। তাতে হোলিকার গায়ের সেই চাদরটি হোলিকার গা থেকে উড়ে প্রহ্লাদের গায়ে জড়িয়ে যায়। ফলে মৃত্যু হয় হোলিকার। প্রহ্লাদ থাকে যথারীতি অক্ষত।

এই ঘটনায় হিরণ্যকশিপু বিস্মিত। ভীতও। তিনি প্রহ্লাদের কাছেই জানতে চান তার বেঁচে যাওয়ার রহস্যটা।

প্রহ্লাদ বলে, সব কিছুই হচ্ছে তার আরাধ্যের কৃপায়। বিষ্ণুর কৃপাতেই বেঁচে যাচ্ছে সে।

—কোথায় থাকে তোমার বিষ্ণু?

—জগৎময় তিনি। এই ত্রিভুবনের সবকিছুতেই বিরাজিত তিনি।

প্রচণ্ড ক্রোধে আরক্ত হিরণ্যকশিপু রাজসভার একটি স্তম্ভ দেখিয়ে বলেন, এরও মধ্যে কি আছে তোমার আরাধ্য ওই বিষ্ণু?

প্রহ্লাদ হ্যাঁ বলতেই হিরণ্যকশিপু সবলে ভেঙে ফেলেন সেই স্তম্ভ। আর তার থেকে

বেরিয়ে আসেন নরসিংহরূপী ভগবান বিষ্ণু। হিরণ্যকশিপুকে নিজের কোলে টেনে দু' হাতের তীক্ষ্ণ নখে তাঁর বুক চিরে হত্যা করেন।

এ তো গেল হিরণ্যকশিপু বধের কথা। কিন্তু তার আগে যে আগুনে হোলিকা পুড়ে ছাই হয়েছিল, সকলে চরম উল্লাসে তার ছাই গায়ে মেখে উল্লাস করতে থাকে। সেটাই হলো হোলির প্রাথমিক রূপ। যার জের টেনে এখনও হোলিতে রং ছাড়া ব্যবহার করা হয় কাদামাটি ইত্যাদি। আবার হোলিকার এইভাবে পুড়ে মরার ঘটনার অনুকরণেই ফাল্গুনের পূর্ণিমার প্রদোষে হোলিকা দহন অনুষ্ঠান হোলির এক অবশ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

দোলের আগে চাঁচর

উত্তর ভারতের হোলির আগের রাতের 'হোলিকা দহন'-কে বলা হয়েছে 'চাঁচর'। এটি হয় পূর্ণিমার আগের রাতে। ওই রাতে খড় দিয়ে ঘর বানিয়ে তাতে রাখা হয় পিটুলি দিয়ে গড়া একটি পুতুল। এই পুতুল হলো হোলিকা বুড়ি অথবা মেঘের প্রতিরূপ। প্রসঙ্গত, চলতি বুলিতে যেটা 'নেড়া পোড়া' সেটি আসলে মেড়া বা মেষ পোড়ার অপভ্রংশ। লোক কাহিনি এই, মেড়া নামে এক অসুর সকলের ক্ষতি করত বলে তাকে এভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

'চাঁচর' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'চর্চরী' থেকে। এর অর্থ এক ধরনের বসন্তকালীন গানবাজনা এবং ছোটোদের খেলা। সে কারণেই বুড়ির ঘর বা চাঁচর ঘরে আগুন দেওয়ার পর ছোটোরা হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে গায়, 'আজ আমাদের নেড়া পোড়া/ কাল আমাদের দোল/পূর্ণিমাতে চাঁদ উঠেছে/বলো হরিবোল।'

লোকোৎসব চাঁচরের শুরুতে সারা বছর ধরে জমে থাকা যত আবর্জনা, শুকনো লতাপাতা, ডালপালা— জড়ো করে তাতে দেওয়া হতো আগুন। পরবর্তীকালে এর পৌরাণিকীকরণ হয়, ওই তথাকথিত বুড়ির ঘরে আগুন দেওয়ার আগে নারায়ণ পূজা করা হয়। অনুমান করা হয়, পরিবেশকে নির্মল রাখাই এর মূল উদ্দেশ্য। বলা যায় এটা হলো পরিবেশের বার্ষিক শৌতীকরণ বা পরিষ্করণ। দোলের আগে পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন করা ছিল এর উদ্দেশ্য।

লোককথা, এদিন ভালো শস্য পাওয়ার প্রার্থনা জানিয়ে কৃষকরা 'অজন্মা' নামের দৈত্য খড়কে পুড়িয়ে মারত।

মূলে ধুন্ধি বধ

হোলিকা দহন বা চাঁচরের উৎপত্তি সম্পর্কে আরেকটি পৌরাণিক কাহিনিতে আছে ধুন্ধি রাক্ষসীকে পুড়িয়ে মারার কাহিনি। পৃথিবীর প্রথম রাজা পৃথুর রাজ্যে হঠাৎই শুরু হলো শিশু ও বালকদের মড়ক। ধুন্ধি রাক্ষসী বাচ্চাদের দেখতে পেলেই গিলে ফেলতে থাকায় রাজ্যে দেখা দিল আতঙ্ক।

রাজা পৃথু কিন্তু কোনোভাবেই রাক্ষসীকে মারতে পারেন না। রাজা মহাবীর কিন্তু এখানে তিনি অসহায়। ধুন্ধি শিবের কাছ থেকে বর পায়, সাধারণ কোনো মানুষ তাকে মারতে পারবে না। অসহায় রাজা তাই পুরোহিতদের পরামর্শ চান।

পুরোহিতরা সবকিছু বিবেচনা করে বলেন, ফাল্গুনীর পূর্ণিমায় বাচ্চা ছেলেদের কাঠকুটো ঘাসপাতা জড়ো করে তাতে আগুন দিতে হবে। তারপর আগুনের চারদিকে তালি দিয়ে নাচতে নাচতে এই মন্ত্র পাঠ করতে হবে। তাহলেই মারা যাবে রাক্ষসী।

তাই করা হলো। মারা গেল ধুন্ধি। রাজ্যে ফিরে এল শান্তি। আর তারপর থেকেই ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাতে আয়োজন করা হয় এই অগ্ন্যুৎসবের। উত্তর ভারতে এরই নাম হোলিকা দহন আর বঙ্গের চাঁচর।

এইসব লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনির সারকথা হলো, এই পৃথিবীতে শুভ ও অশুভ দুটোই আছে। শুভবোধের আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে সবরকম

অশুভকে। তাহলেই ব্যক্তি তথা সমাজ ও সারা দেশের মানুষকে রাঙিয়ে তোলা যাবে প্রেম, একতা ও সংহতির আবির গুলালে।

সুপ্রাচীন এই অনুষ্ঠান

রূপ ও রঙ্গে দোল আর হোলি প্রায় সমার্থক। তবে বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করার পর মনে হয় বর্তমান রূপে হোলিই তুলনায় প্রাচীন। বিশেষ করে এই রঙের উৎসবের কেন্দ্রে রাধাকৃষ্ণের অধিষ্ঠান হয়েছে অনেক পরে। অতীতে যা ছিল মদনোৎসব সেটাই নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান হোলি এবং দোলের রূপ দেখে এমন কথাই বলেন অনেকে। উত্তরের চেয়ে দক্ষিণ ভারতে মদনোৎসব বেশি চালু ছিল বলে অনেকের অনুমান।

দক্ষিণ ভারতের মদনোৎসবে কামের অধিপতি মদনের দহন জ্বালা কমানোর জন্য আমপাতা দিয়ে জল সিঞ্চন ও চন্দনের প্রলেপ দেওয়া হয় দেবতা কল্পিত ঘটে এবং সেটাই আবার মাখানো হয় পরস্পরকে।

এই অগ্ন্যুৎসব এবং রং খেলা ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সুপ্রাচীনকাল থেকেই। এই অনুষ্ঠানের নানা দিকের কথা আছে অথর্ববেদে, গর্গ-সংহিতায়, জৈমিনীর পূর্বমীমাংসায়, নারদ পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণে। আছে বাৎসায়নের কামসূত্র, দণ্ডীর দশকুমার চরিত, কালিদাসের ঋতুসংহার, প্রাকৃত কবি হাল-রচিত গাথা— সপ্তশতী ইত্যাদি গ্রন্থে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এই উৎসবের বহিরঙ্গে নানা বদল ঘটলে অন্তরঙ্গে বর্তমান আজও চিরন্তন প্রেম ও সংহতির কথা।

কেন্দ্রে রাধাকৃষ্ণ

দোলের কেন্দ্রে রয়েছেন রাধাকৃষ্ণ ও বৃন্দাবনের গোপিনীরা। তবে উৎসব শুরুর কাহিনিগুলি এক নয়। একটি কাহিনিতে আছে পুতনার বিষাক্ত স্তন্যদুগ্ধ পান করে শ্রীকৃষ্ণের রং নীল বা কালো হয়ে যায়। তাই মা যশোদা সবসময় কৃষ্ণকে রং মাখিয়ে রাখতেন। আর সেটা থেকেই শুরু হয় রঙের খেলা।

অন্য কাহিনি, কৃষ্ণের ভয় ছিল কালো রঙের জন্য রাধা হয়তো তাঁকে পছন্দ করবেন না। তার এই ভয়ের কথা শুনে মা যশোদা বলেন, তুমি তাহলে রং চুপিচুপি রাধাকে তোমার ঘরের মনের রং মাখিয়ে দাও। তাহলেই সে আর তোমাকে কালো বলে উপেক্ষা করতে পারবে না। মায়ের কথায় কৃষ্ণ তাই করে। আর তার থেকেই শুরু হয় রঙের খেলা দোল।

আরেক কাহিনি, ফাল্গুনের এই পূর্ণিমাতেই বৃন্দাবনে যমুনা তীরের কদমবনে গোপবালক এবং গোপ বালিকাদের সঙ্গে রং খেলায় মেতেছিলেন কৃষ্ণ। খেলার মধ্যেই সকলে রাধা ও কৃষ্ণকে দোলায় বসিয়ে গান গাইতে গাইতে দোল দিতে থাকেন। সেই সঙ্গে রাঙিয়ে দেন তাদের আবিরে গুলালে। পালটা কৃষ্ণও রং মাখান সকলকে। আর ওইভাবেই শুরু হয় রঙের উৎসব দোলের।

আরেক কাহিনি, কৃষ্ণ কেশী দৈত্যকে বধ করার পর গোপবালকরা তার রক্ত ছিটিয়ে দিতে থাকে পরস্পরের দিকে। আর সেটাই ছিল দোলের সূচনা। আর এসবেরও আগে রয়েছে প্রহ্লাদ ও নরসিংহের কাহিনি। হোলি উৎসবের বীজ লুকিয়ে আছে তারই মধ্যে— এটাই দাবি করেন বৈষ্ণব পণ্ডিত মণ্ডলী।

শৈব শাক্ত তন্ত্রে

দোল, হোলি বা বসন্ত উৎসবের কথা কেবল বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রে রয়েছে তা কিন্তু নয়। শাক্ত ও শৈব তন্ত্রগুলিতেও রয়েছে এই উৎসবের কথা। সেখানে উৎসবের মূলে রয়েছেন শিব-পার্বতী এবং প্রেমের দেবতা মদন ও রতি।

দক্ষযজ্ঞের পর শিব হন ধ্যানমগ্ন। গভীর ধ্যানের অতলে তলিয়ে যান তিনি। ওদিকে সতীও হিমালয়নন্দিনী রূপে জন্ম নিয়ে শিবের জন্য সাধনা করতে থাকেন। কিন্তু শিবের ধ্যান আর ভাঙে না। তাই মিলন হয় না শিব-পার্বতীর।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কামদেবকে শিবের প্রতি কামশর নিক্ষেপ করতে বলেন পার্বতী। শিবের ক্রোধের ভয়ে দোনামনা করেও রাজি হন কামের অধিপতি মদন। নিক্ষেপ করেন পুষ্পবান। ধ্যান ভাঙে শিবের। তাঁর তৃতীয় নয়নের আগুনে ভস্ম হন মদন। কিন্তু তাঁর অব্যর্থ শরের প্রভাবে শিবের দু'চোখে তখন প্রেম। মিলন হয় শিব-পার্বতীর।

পতিহারা রতি এবার বসেন তপস্যায়। ৪০ দিন ধরে তিনি ডাকেন শুধু শিবকে। রতির বিলাপে অবশেষে তুষ্ট শিবের কৃপায় প্রাণ ফিরে পান মদন। আর সেই উপলক্ষ্যে শুরু হয় বসন্ত মহোৎসব বা কামমহোৎসব।

মূলবার্তা একই

দোল বা হোলি সম্পর্কে এই যে সব পুরাণকথা বা লোককথা— তার থেকে মনে হয় সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত একটি ধর্মীয় অথবা সামাজিক অনুষ্ঠান তার চলার পথে বাঁক নিয়েছে বহুবার। গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন ঘটেছে বারবার। কিন্তু এই উৎসবের যে মূলবার্তা অথবা উদ্দেশ্য, যাই বলা হোক না কেন, তার কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। আর তার মধ্য দিয়েই ভারতের যে অপরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য— তারই প্রতিফলন ঘটেছে আরও সুন্দরভাবে। বর্ণময়তা আর বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্যের কথা উচ্চারিত হয় বহুবার— বহু কারণে— বহুরূপে, তারই এক পরিণত সজীব উদাহরণ এই উৎসব।

এক থেকে বহু অথবা একেই বহুর অবস্থান— এটাই ভারতীয় দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। আর সেই বিন্দু ঘিরেই দোল বা হোলির আবর্তন। পূজা-অর্চনা অবশ্যই এর একটা অঙ্গ, কিন্তু সেটাই প্রধান বা সব নয়। এই হোলিকা দহন অথবা রঙের খেলার মূল বার্তা প্রেম— আত্মিক। সে প্রেম দেহাতীত। ব্যক্তিগত স্তর থেকে সে প্রেম জাতীয় এবং তার থেকে বিশ্বজনীন মিলনের পথে এগিয়ে যায়। সে প্রেমের লক্ষ্য জাতীয় ঐক্য ও সংহতি। আর সে কারণেই ধর্মের ছোঁয়ায় রঙিন এই অনুষ্ঠান— অবশ্যই একটি জাতীয় উৎসবের উৎসববার্তা। ■

গুজরাটে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় অধিবেশন

গত ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি গুজরাটের পালনপুরে অনুষ্ঠিত হলো ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের ১৪তম অখিল ভারতীয় অধিবেশন। তিন দিবসীয় এই অধিবেশনে সারা দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অখিল ভারতীয় অধ্যক্ষ ও মহামন্ত্রী নির্বাচন করা হয়। এই অধিবেশনে দু'টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবটি হলো, জৈবিক কৃষি একটি দায়িত্ব এবং দ্বিতীয়টি হলো, সমগ্র গ্রামবাসীর দৃষ্টিতে কৃষি মানব সম্পদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। প্রথম প্রস্তাবের মাধ্যমে দেশের সমস্ত কৃষকের কাছে জৈবিক কৃষি গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে কৃষিনীতির সংশোধন ও পরিবর্তন করে কৃষি উৎপাদনের ন্যায্যমূল্য প্রদান, প্রক্রিয়াকরণ, গুদামজাত , বিপণন বাণিজ্য, গ্রামোদ্যোগ, হস্তশিল্প প্রভতির মাধ্যমে গ্রাম স্বাবলম্বনের বিষয় উপস্থাপন করা হয়।

অধিবেশনে তেলেঙ্গানা রাজ্যের সাঈ রেড্ডীকে অখিল ভারতীয় অধ্যক্ষ এবং ওড়িশার মোহিনীমোহন মিশ্রাকে পুনরায় অখিল ভারতীয় মহামন্ত্রী নির্বাচিত করা হয়। অধ্যক্ষ ও মহামন্ত্রী দ্বারা ঘোষিত ৫১ জনের কার্যকারিণীতে উপাধ্যক্ষ টি পেরুমল, রাম ভরোস বাসোতিয়া, বিশাল চন্দ্রাকর, সুশীলা বিশনোঈকে নির্বাচিত করা হয়। অখিল ভারতীয় মন্ত্রীর দায়িত্বে বাবু ভাই প্যাটেল, ড. সোমদেব শর্মা, ভানু থাপা ও বীণা সতীশ; কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বে যুগল কিশোর মিশ্র; সংগঠন মন্ত্রী দিনেশ কুলকর্ণী, সহ সংগঠন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিংহ; জৈবিক প্রমুখ নানা আখরে; মহিলা সংযোজিকা মঞ্জু দীক্ষিত; কার্যালয় প্রমুখ চন্দ্রশেখরজী এবং অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ হিসেবে রাঘবেন্দ্র সিংহ প্যাটেলের নাম ঘোষণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণ কুমার মণ্ডল অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য এবং শ্রীনিবাস উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চালের সংগঠন মন্ত্রী মনোনীত হন।অধিবেশনের দ্বিতীয়দিনে সর্দার কৃষিনগর দান্তীওয়াড়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালনপুর পর্যন্ত একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। তাতে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা তাঁদের পরম্পরাগত পোশাকে সম্মিলিত হয়। শোভাযাত্রায় ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে ব্যানার দিয়ে সকলের কাছে বার্তা দেওয়া হয়— গোআধারিত কৃষি, বিষ নয় জৈবিক চাই। অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন দান্তীওয়াড়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আরএম চৌহান। অধিবেশন পরিসরে কৃষি প্রণালী, গোআধারিত জৈবিক কৃষি, জৈব সার, পশুপালন, বীজ নির্মাণ প্রভৃতি প্রদর্শনী রাখা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিজ্ঞানীরা উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করে জৈবিক কৃষিকাজে লাভের বিষয়ে পরামর্শ দেন।

বর্তমানে সারা দেশে ৬০ হাজার গ্রামে কিষাণ সঙ্ঘের সক্রিয় সমিতি রয়েছে। এই গ্রাম সমিতির মাধ্যমে ৪২ লক্ষ কৃষক কিষাণ সঙ্ঘের সদস্য পদ গ্রহণ করেছেন। সারা দেশের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ রাজ্যে আয়োজিত বিভিন্ন সংগঠনাত্মক, আন্দোলনাত্মক কর্মসূচির বিবরণ প্রদান করেন।

অধিবেশনে মহিলা কার্যকর্তারা বড়ো সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। সমস্ত কাজে তাঁদের অংশগ্রহণ তথা নেতৃত্ব প্রদান অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

গুয়াহাটিতে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির দ্বি-দিবসীয় বৈঠক

গত ২২-২৩ ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটি আইআইটি পরিসরে সম্পন্ন হয় রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির অখিল ভারতীয় বৈঠক। দেশের ৩৪টি প্রান্ত থেকে ১০৮ জন প্রতিনিধি বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। সমিতির প্রমুখ কার্যবাহিকা এ সীতা সংগঠনের বর্তমান কার্যস্থিতি, বিগত কার্যক্রমের বিবরণ-সহ আগামী কার্যযোজনার বর্ণনা করেন।

বর্তমানে দেশের ১২টি ক্ষেত্রের ৩৮টি প্রান্তে সেবিকা সমেতির ৪১২৫টি শাখা চলছে। মোট ১০৪২ জেলার মধ্যে ৮৩৪ জেলায় সমিতির কাজ রয়েছে। সেবিকাদের মাধ্যমে সারা দেশে ১৭৯৯টি সেবাকাজ চলছে। প্রসঙ্গত, এই বছর সন্ত নামদেবের ৬৭৫তম, রানি দুর্গাবতীর ৫০১তম এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী বর্ষ। তাঁদের প্রেরণাদায়ী জীবন চরিত্রকে সমাজের সামনে উপস্থাপন করা এবং তাঁদের ভাবনাকে নিজজীবনে গ্রহণ করার আহ্বান করা হয়। সমিতির প্রমুখ সঞ্চালিকা ভি শান্তা কুমারীজী বলেন, বিশ্বকল্যাণের অভিলাষী হিন্দু জীবনশৈলী আচরণের বিষয়, এর জন্য আমাদের সকলকে নিজের জীবনে প্রস্ফুটিত করতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রকে বৈভবশালী করার জন্য পঞ্চ পরিবর্তনের বিষয়কে (স্ব-এর অভিব্যক্তি, কুটুম্ব প্রবোধন, সামাজিক সমরসতা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নাগরিক কর্তব্যবোধ) ব্যক্তিগত জীবনে, আচরণে সাকার করে সমাজজীবনে তার বিস্তার ঘটাতে হবে।

ত্রিপুরা প্রান্ত স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের রাজ্য সম্মেলন

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ, ত্রিপুরা প্রান্তের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রাজধানী আগরতলার রবীন্দ্র ভবনে। উপস্থিত ছিলেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের রাষ্ট্রীয় যুগ্ম সংগঠন মন্ত্রী সতীশ কুমার, রাষ্ট্রীয় যুগ্ম সংযোজক ধনপতরাম আগরওয়াল, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংযোজক তরণী ডেকা, ত্রিপুরা রাজ্য সহ সংযোজক শিবাজী বসু এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ত্রিপুরা প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিমলকান্তি রায়। সারা রাজ্য থেকে তিনশোর বেশি প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রীয় যুগ্ম সংগঠন মন্ত্রী সতীশ কুমার বলেন, দেশকে উন্নত করতে হলে দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করা দরকার। রাজ্যে যে সম্পদ আছে তাকে কাজে লাগিয়ে যুবপ্রজন্মকে স্বাবলম্বী হতে হবে। এতে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি অর্থনৈতিক কাঠামোও মজবুত হবে। উল্লেখ্য, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ তিন-চার বছর আগে রাজ্যে কাজ শুরু করেছে। প্রতিটি জেলায় কমিটি রয়েছে। সতীশ কুমার বলেন, দেশের ৯০ ভাগ জেলায় স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের কাজ রয়েছে। সচেতনতামূলক কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে চলছে। সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে ৮ জেলাতেই কাজ শুরু হয়েছে। ত্রিপুরার তিনটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র প্রথম, ডেয়ারি শিল্প, দ্বিতীয়, বাঁশ ও বেতের শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং তৃতীয়, তথ্য প্রযুক্তির কথা উল্লেখ করেন তিনি।

কলকাতায় সংস্কৃতভারতীর সংস্কৃত সম্মেলন

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাসের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হলো বিশাল সংস্কৃত সম্মেলন 'সংস্কৃতপ্রবাহ'। সংস্কৃতভারতী দক্ষিণবঙ্গ দ্বারা আয়োজিত এবং পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি পরিষদের (ইজেডসিসি) সহায়তায় বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। সংস্কৃতভারতীর কার্যকর্তা তথা সদস্যদের দ্বারা পরিবেশিত হয় সংস্কৃত

গান, গীতাপাঠ, মহিষাসুরমর্দিনী নাটক প্রভৃতি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতভারতীর রাষ্ট্রীয় সম্পাদক ও বিদেশ বিভাগ প্রমুখ ড. পি নন্দকুমার, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিসের ডিরেক্টর ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ, সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের বিজ্ঞানী ড. জিষ্ণু বসু, সংস্কৃতভারতীর পূর্বক্ষেত্র প্রমুখ প্রণব নন্দ প্রমুখ। উপস্থিত বক্তারা তাঁদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতভাষার প্রাচীনত্ব, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সম্মেলনের শুরুতেই পত্রাচার দ্বারা সংস্কৃত পাঠ্যক্রমে কোবিদ উত্তীর্ণ ৬৯ জন শিক্ষার্থীকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

সংস্কার ভারতী ভরতমুনি স্মরণ অনুষ্ঠান

গত ১২ ফেব্রুয়ারি সংস্কার ভারতী, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উদ্যোগে মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরে নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা ভরতমুনি স্মরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী মেদিনীপুর জেলা সভাপতি পূর্ণেন্দু মাঝি ও কনক পাণিগ্রাহী, জেলা মুখ্য উপদেষ্টা ড. জগমোহন আচার্য, উপদেষ্টা মৃগাঙ্কশেখর মাইতি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুর জেলা সঙ্ঘচালক আশিস পান।

সংস্কার ভারতীর ভাবসংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। মঞ্চাসীন অতিথিদের বরণ করার পর তাঁরা প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তাসের দেশ গীতিনাট্যের দুখানি গান পরিবেশন করেন সৌমেন্দ্র হোতা এবং সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা। ভরতমুনি সম্মান-২০২৫ প্রদান করা হয় স্থানীয় অভিনেতা ও নাট্যকার চিন্ময় ঘোষকে। সেই সঙ্গে ১০টি নাট্যসংস্থাকেও সম্মাননা প্রদান করা হয়। বাঞ্ছারামের বাগান নাটকের কিছু অংশ অভিনয় করেন নাট্যবিধা দেবাশিস সিংহ ও চন্দ্রশেখর দাস। নৃত্যাঙ্কুর সংস্থা পরিবেশন করে 'দুষ্যন্ত ও শকুন্তলাপুত্র ভরত' নৃত্যনাটিকা। সৌমেন্দ্র হোতা ও বন্দনা চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' আলেখ্য পরিবেশন করেন। শেষে স্থানীয় প্রয়াস নিবেদিত বিমল মুখোপাধ্যায় রচিত নাটক 'একটি অবাস্তব গল্প' পরিবেশিত হয়। জেলা সম্পাদক তিমির কুমার বর্মনের শান্তিমন্ত্রোচ্চারণের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

কলকাতা তারাসুন্দরী পার্কে পিতৃ-মাতৃ পূজন সমারোহ

কলকাতার প্রসিদ্ধ সামাজিক সংস্থা মারুতি সেবা সমিতির উদ্যোগে গত ১০ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় তারাসুন্দরী পার্কে পিতৃ-মাতৃ পূজন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৯০ পিতা-মাতাকে তাদের পুত্র-কন্যারা যথারীতি পূজা করে। উল্লেখ্য, এবারের এটি সপ্তম আয়োজন। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাগবাজারের গৌড়ীয় মঠের শ্রীমৎ হৃষীকেশ দাস মহারাজ। তিনি বলেন, কলিযুগের প্রভাবে একদিকে পিতা-মাতারা তাঁদের সন্তানসন্ততিকে সময় দিতে পারেন না, অন্যদিকে সন্তানরাও পিতা-মাতাকে কেবলমাত্র তাদের উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম হিসেবেই দেখে থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে পিতৃ-মাতৃ পূজনের আয়োজন সনাতন সংস্কৃতি সংরক্ষণের দিশায় এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। মনে রাখতে হবে, সনাতন সংস্কৃতির আধারশিলা হলো পিতৃ-মাতৃপূজন।

অনুষ্ঠানের মুখ্যবক্তা অজয়েন্দ্রনাথ ত্রিবেদী বলেন, সন্তানসন্ততিকে সংস্কার প্রদানের কাজ পিতা-মাতার দ্বারাই হতে পারে। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজকে জীবনের সর্বক্ষেত্রের সংস্কার তাঁর মা জীজাবাঈ দিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মাতৃভক্তির কথা সর্বজনবিদিত।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পার্ষদ বিজয় ওঝা বলেন, মা তাঁর সন্তানকে সুসংস্কারিত করেন। তাই সন্তানের প্রথম গুরু হলেন তার মা। সনাতন সংস্কৃতিতে মা হলেন জীবনদায়িনী শক্তি। অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রখ্যাত সমাজসেবী তথা মাহেশ্বরী সভার অধ্যক্ষ বুলাকীদাস মীমাণী বলেন, 'পিতৃ-মাতৃ দেবো ভবঃ'-র ধারণা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণবিন্দু। এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য তিনি মারুতি সেবা সমিতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। কুমারসভা পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মহাবীর বজাজ বলেন, এরকম সংস্কারমুখী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সমৃদ্ধ ভারত নির্মাণ করতে পারবো। পার্ষদ মীনা পুরোহিত উপস্থিত মাতৃমণ্ডলীর প্রতি আবেদন রাখেন সংস্কারক্ষম পরিবার নির্মাণের।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মারুতি সেবা সমিতির সংরক্ষক নবনীত দুবে এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমিতির অধ্যক্ষ রাজেশ কুমার দুবে।

কলিগ্রাম সরস্বতী শিশু মন্দিরের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি মালদহ জেলার কলিগ্রাম সরস্বতী শিশু মন্দিরের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মাতৃবন্দনা ও প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন চাঁচল বিএড কলেজের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ বর্মন এবং শিশু মন্দিরের প্রধান আচার্য প্রসেনজিৎ প্রামাণিক। উপস্থিত ছিলেন শিশু মন্দিরের সমস্ত আচার্য- আচার্যা, সহায়ক-সহায়িকা এবং পরিচালন সমিতির সদস্যরা। শিশু মন্দিরের ভাই-বোনেরা আবৃত্তি, নৃত্য ব্যায়ামযোগ, পিরামিড, সংগীত, নাটিকা পরিবেশন করে।

এছাড়াও বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী- দের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে সহস্রাধিক গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করেন।

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

রানি রাসমণি : পাশ্চাত্য শিক্ষা ও হিন্দুধর্ম

পিনাকী দত্ত

এ মন্দির থেকে সে মন্দির ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে যেতে হবে দক্ষিণেশ্বরে এবং সেই সূত্রেই ধরে ফেলতে হবে যুগ পরিবর্তনের সেই কালকে। একদিন একটি সূত্র ধরে জানবাজারে হাঁটাহাঁটি করছি। দক্ষিণেশ্বরেও গিয়েছি। মাথায় ঘোরাফেরা করছে ঊনবিংশ শতাব্দী। জাতির জীবনে খুব বড়ো সন্ধিক্ষণ। বৃহৎ সংকট। আবার উত্তরণের চাবিকাঠিও।...

মায়ের চিন্ময়ী মূর্তি ও শ্রীচরণ দর্শনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ লাইনে প্রতীক্ষা। অবশেষে মা ভবতারিণীর দর্শন।

মন্দিরের চারিদিকে ঘুর ঘুর করছি। আমি তো মন্দিরের নির্মাণকৌশল ও ইতিহাস নিয়ে ভাবিত। যিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন, তাঁকে জানতে গেলে আগে যে তাঁর নির্মিতিকেই ধরতে হবে।

আমার বাসস্থান থেকে মাত্র ৮/৯ কিলোমিটার হবে, একটি বাসে করেই যাওয়া যায়। গঙ্গার কোল ঘেঁষে দক্ষিণেশ্বর। এ নামের সঙ্গে আজ বিশ্ববাসী পরিচিত।

রানি রাসমণি মন্দির নির্মাণে যখন উদ্যোগ নেন, তখন এই স্থানের পরিচিতি ছিল কথঞ্চিৎ। অজস্র গণ্ডগ্রামাঞ্চলের একটি। সুবে বাঙ্গলার আর পাঁচটা গ্রামের মতো মাঝে মধ্যে দুর্ভিক্ষপীড়িত। একনাগাড়ে হাঁটা যায় না। কারণ, ভালোভাবে পায়ে-চলা পথ থাকা দূরের কথা, এখানে-ওখানে জলাজঙ্গল। বাসিন্দারা হতদরিদ্র। তাঁদের প্রায় সকল নিবাসই জীর্ণ। জমিদারের কর্মচারীরা এলে তারা ভীত, সন্ত্রস্ত। খড়কুটোর মতো যে যার সম্বলকে আঁকড়ে ধরে থাকে। সামাজিক ও তথাকথিত ধর্মীয় অনুশাসন সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবনে পীড়নের মাত্রা বাড়ায় মাত্র। ব্রাহ্মণরা সদর্পে অন্ত্যজদের স্পর্শ এড়িয়ে চলে, যদিও ছড়ি ঘোরাতে সদা তৎপর। বাসিন্দাদের মধ্যে কিছু পরিবার মুসলমান। তাদের কয়েকটি কবরস্থানও রয়েছে। কিছুকাল আগেও তারা ছিল রাজার জাত। এখন কিন্তু তাদের সেই হৃতসম্মান পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা আর নেই বললেই চলে। যে জাদুমন্ত্রে মহাবিদ্রোহ পরবর্তীকালে প্রজ্বলিত হয়েছিল, তার বীজ তখন সেখানে বপন করা হয়নি।

অতএব স্থানিক দুর্বলতা সত্ত্বেও গ্রামটির কিছু নিজস্ব গুরুত্ব ছিল। গুরুত্বের কারণ সাহেবদের তৈরি একটি বারুদের কারখানা। কারখানার নাম 'ম্যাগাজিন'। সেখানে প্রায়ই গোরা সৈন্যরা ঘোড়া ছুটিয়ে আসত। ভারতীয় সিপাহিরাও টহল

দিত। এছাড়া কোনো কোনো দিন জমিদারের সপারিষদ ফিটনগাড়ির বিহার গ্রামবাসীদের মনে যুগপৎ ভীতি ও সম্ভ্রমভাবের উদ্রেক করত। অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের প্রভাব সেই গণ্ড এলাকায় তখন ভালোভাবেই অনুভূত।

অদূরে কলকাতা। তিলে তিলে তিলোত্তমা হয়ে উঠবার সাধনায়। সেখানে তো তখন জীবনের আপতিক চরিতার্থতা নিয়ে যুবসমাজের একটা বড়ো অংশ সংস্কারমুখী— যে সংস্কার ভালো ও মন্দ সকল কিছুকেই চূর্ণ করতে চায়। অনুসরণীয় পথের খোঁজ করতে গিয়ে তাঁদের ধারণা হয়েছে, পশ্চিমি শিক্ষা ও আচার-বিচার সনাতনী শিক্ষা ও পরম্পরার তুলনায় উৎকৃষ্টতর। অতএব উন্নততর মানুষ হতে গেলে বন্ধনমুক্ত পশ্চিমি ভাবধারাকে আঁকড়ে ধরতে হবে।

এই আবহকে উত্তাল করে তোলার জন্য তৎকালীন সামাজিক মঞ্চে একদল জবরদস্ত সংস্কারপন্থী উপস্থিত। তাঁরা আলোড়ন তুলতে কিছুটা কৃতকার্যও হয়েছেন। তাঁদের সেই আংশিক সাফল্যের মুখ্য কারণ দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও বৈষম্যে জর্জরিত হিন্দুদের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়েছিল হরেক জাতের দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার, কায়েমি স্বার্থ ও ধর্মের নামে কদাচার। সেই সময়ে সংস্কারের ডাক না এলে একটা গোটা জাতিই যে জাহান্নামে যাবে।

হিন্দুদের মধ্যে দুটি ভাবের প্রাধান্য— শাক্ত ও বৈষ্ণব। সেই দুটি ভাবই তখন পঙ্কিল, বহুধা বিভক্ত এবং পারস্পরিক দোষারোপে মগ্ন। পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করবার সাধনা নেই। পার্থিব বস্তু ও ভোগের লালসায় ন্যায়নীতি বিসর্জন দিতে সমাজপতিরা অভ্যস্ত। ধর্মের নামে শোষণ প্রবলভাবে চালু। নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে বিদ্যমান যে ঈশ্বর, তাঁকে অনুভব করবার তন্নিষ্ঠ প্রয়াস কোথাও নেই। শ্রীচৈতন্য যে সাম্য ও উদারতা এনেছিলেন, তার প্রভাব তখন কুয়াশাচ্ছন্ন। সাধারণ মানুষের কাছে বৈষ্ণব মানেই যেন ভিক্ষোপজীবী অন্ত্যজ নারী ও পুরুষ।

অনুরূপ অধঃপতন তখন শাক্তদেরও। সাধক রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের ভক্তির সমন্বিত উদারতা তখন ক্ষীয়মাণ। তন্ত্র ও তান্ত্রিকতা সম্পর্কে প্রচুর বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণা মানুষকে ভীত করে রেখেছে।

হিন্দুধর্মের ও সমাজের ওই দুর্দশার পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছেন পশ্চিমি ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট সংস্কারপন্থীরা। হিন্দু সমাজের অনাচার ও অবিচারের সূত্র ধরে তাঁদের একটা বড়ো অংশ হিন্দুদের উপাস্য দেব-দেবী ও শাস্ত্র সম্পদকেই আক্রমণের লক্ষ্য করে তুললেন। তাঁদের মূঢ় অবজ্ঞা প্রকৃত সংস্কারের বদলে অনিষ্টের পরিমাণ বাড়িয়ে দিল। খ্রিস্টমত যে— হিন্দুধর্মের তুলনায় শ্রেষ্ঠ— এরকম একটা বায়বীয় তত্ত্ব অনেক প্রতিষ্ঠিত পরিবারে অনুপ্রবেশ করে এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে ঘোরালো করে তোলে। নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের হেনস্থা বাড়ে।

তবে সংস্কারকর্মে ব্রাহ্মসমাজের অবদান অবশ্যই মহৎ ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে সার্থক। তাঁদের কাজ যতটা না উন্মাদনাপূর্ণ, তার চেয়ে অনেক বেশি যুক্তিনিষ্ঠ। ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বদের মেধা ও বাগ্মিতা সমাজের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণদের আকর্ষণ করেছিল। ওই সমাজের প্রধানরা কিন্তু কোনো নতুন ধর্মের দিশা দেখাননি। তাঁদের উপদেশ, বাণী সকলই চয়ন করা হয়েছে উপনিষদ থেকে। কিন্তু উপনিষদের সমস্তটুকু তাঁরা নেননি বা নিতে পারেননি। হিন্দুধর্মের বিশালত্ব, চড়াই-উতরাই অতিক্রম করবার দিশা বাস্তবিক পক্ষে পূর্ণরূপে ব্রাহ্মমতে লভ্য নয়। তাই অধিক আগুয়ান হতে গিয়ে কোনো কোনো উৎসাহিত ব্যক্তি অনর্থের কারণও হয়েছেন। চমকের শিহরণ স্থায়িত্ব পায়নি।

ব্রাহ্মরা যেন বিশেষভাবে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন হিন্দুদের বিগ্রহপূজার বিরুদ্ধে। অথচ মূর্তিপূজার তাবৎ তাৎপর্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা অনুভব করি যে সাধনায় সিদ্ধিলাভে বিগ্রহের আরাধনা কত সহায়ক। তাছাড়া হিন্দুধর্মে সাকার ও নিরাকার উভয় ভাবনারই ব্যাপ্তি ঘটেছে। সেখানে সাকারতত্ত্বকে একবর্গীয় আক্রমণ করে সাময়িক বিস্ময়ন সম্ভব হলেও সনাতন ধর্মের পুনরুজ্জীবন তাঁরা আটকাতে পারেননি। তাই রানি রাসমণির ব্যাপক সংগঠন, শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন এবং স্বামী বিবেকানন্দকৃত বিপুল আলোড়ন হিন্দুধর্মকে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

হিন্দুদের ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার করুণ অবস্থা সুযোগ করে দিল পশ্চিমি শিক্ষা ও কায়দায় পুষ্ট একদল সংস্কারবাদীকে। তাঁরা সদম্ভে আঘাত হানতে চাইলেন হিন্দুধর্মকেই। তাঁদের আকস্মিক ঔজ্জ্বল্যে সনাতন কৃষ্টির প্রতি আস্থা হারিয়ে তরুণ প্রজন্মের একাংশ সাহেবি চালচলনের প্রতি মোহান্ধ হয়ে পড়েন। তাঁদের অবস্থান তখন সত্য থেকে স্বতন্ত্র। বেদান্ত ও যোগের তাৎপর্য অনুধাবনে তাঁরা অসমর্থ। তাঁদেরও সেই এক প্রচার— পৌত্তলিকতাই হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা। সনাতন ধর্মকে হেয় করতে পারলেই তাঁরা গর্বিত। ধার্মিক ব্যক্তিকে অন্তঃসারশূন্য ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তাঁরা বলেন কুসংস্কারগ্রস্ত।

তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁরা হিন্দুদের মধ্যে এক প্রকার দিশেহারা ও অসহায়ত্ববোধের সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। একদিকে স্বার্থান্ধ হিন্দু সমাজপতিদের নানা পন্থায় শোষণ ও অত্যাচার, অন্যদিকে আধুনিকতা ও সংস্কারের নামে সনাতন ধর্মকে অপমান করা— এই দুয়ের চাপে পড়ে পিষ্ট হচ্ছিলেন ধর্মবিশ্বাসী সাধারণ মানুষ।

এমত যুগপৎ ঐশী ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতেই লোকমাতা রানি রাসমণির আবির্ভাব। যে পশ্চিমি শিক্ষা হিন্দুধর্মকে অবজ্ঞা করতে শেখাবার চেষ্টা করেছে, যে জীবনযাত্রা ক্ষণিকের আনন্দের বিনিময়ে ভবিষ্যতের বিপুল দুঃখের কারণ হতে চলেছে, রানি রাসমণি অপ্রত্যক্ষভাবে তার বিরুদ্ধে যেন পরিখা খনন করে যান। তিনি জাতির সাক্ষাৎ জননী। □

সত্য ও সুন্দরের মিলন বিন্দু শিব

রতন চক্রবর্তী

সত্যই সুন্দর। আর শিবই পরম সত্য। আদি শঙ্করাচার্য নির্বাণ ষটকম্-এর শ্লোকে সত্যেরই পরিচয় করিয়েছেন। সেই পরম সত্যে পৌঁছনোর প্রথম ধাপ হিসেবে ভক্তিকেই আশ্রয় করতে হয়। 'শিবরাত্রি' উপলক্ষে শিব সারা ভারতবর্ষব্যাপী পূজিত হন। সনাতন ধর্মের শাস্ত্রসমূহে শিব পরমসত্ত্বারূপে ঘোষিত। সংস্কৃত শিব শব্দের অর্থ শুভ, দয়ালু ও মহৎ। শিব সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। সনাতন ধর্মের আদিযুগ থেকেই শিব পূজিত হয়ে আসছেন। সুবিশাল বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন অংশে শিব-এর মাহাত্ম্য বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছে। ঋগ্বেদে শিব রুদ্র নামে পরিচিত। তিনি জন্মরহিত, শাশ্বত, সর্বকারণের কারণ, সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি।

শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে বলা হয়েছে, 'যদাহতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্নসন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ' অর্থাৎ যখন আলো ছিল না অন্ধকারও ছিল না, দিন ছিল না রাত্রিও ছিল না, সৎ ছিল না অসৎও ছিল না তখন কেবলমাত্র ঈশ্বর শিবই ছিলেন। ভগবান শিব সৃষ্টির প্রাক্কালে শ্রীবিষ্ণুকে বলেন—

'অহং ভবানয়শ্চৈব রুদ্রোহয়ং যো ভবিষ্যতি।

একং রূপং ন ভেদোহস্তি ভেদে বন্ধনং ভবেৎ।।

তথাপীহ মদীয়ং শিবরূপং সনাতনম্।

মূলভূতং সদা প্রোক্তং সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্।।' (জ্ঞানসংহিতা)

অর্থাৎ আমি, তুমি, এই ব্রহ্মা এবং রুদ্র নামে যিনি উৎপন্ন হবেন এই সকলেই এক এদের মধ্যে কোনো ভেদ নাই। ভেদ থাকলে বন্ধন হতো। তথাপি আমার শিব রূপ সনাতন এবং সকলের মূল স্বরূপ বলে কথিত হয় যা সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ।

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ব্যাকরণ পাণিনি রচিত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ। ১৪টি শিবসূত্র বা মাহেশ্বর সূত্র পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর মূল সূত্র। এই সূত্রগুলি হলো—

১. অ ই উ ণ্, ২. ঋ ৯ ক্, ৩. এ ও ঙ, ৪. ঐ ঔ চ, ৫. হ য ব র ট্, ৬. ল ণ্, ৭. ঞ ম ঙ ণ ন ম্, ৮. ঝ ভ ঞ, ৯. ঘ ঢ ধ ষ্, ১০. জ ব গ ড দ শ্, ১১. খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ব্, ১২. ক প য্, ১৩. শ ষ স র্, ১৪. হ ল্। কথিত, 'অ ণ্' থেকে 'হ ল্' পর্যন্ত এই সুত্রগুলি শিবের ডমরু থেকে উৎপন্ন হয়েছে ১৪টি বিভিন্ন রকম শব্দের ফলে। অর্থাৎ শিবের ডমরু থেকে উৎপন্ন চতুর্দশ শিবসূত্র থেকেই ব্যাকরণ বিদ্যার উৎপত্তি।

শিব নাট্যশাস্ত্রের আদি প্রবক্তা। শিব নাট্যশাস্ত্রের জ্ঞান প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দিয়েছিলেন। ব্রহ্মা ব্রহ্মার থেকে ভরত মুনি এই জ্ঞান লাভ করেন যা ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্র' নামে পরিচিত।

শিবকে যোগের দেবতাও মনে করা হয়। তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে 'সদ্গুরু' নামে খ্যাত জাগ্গী বাসুদেবের নকশায় তৈরি 'আদিযোগী' মূর্তি বর্তমানে সারা পৃথিবীর পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র। এছাড়াও তিনি চিকিৎসাবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যার আবিষ্কারক। শিবকে সাধারণত 'শিবলিঙ্গ' নামক বিমূর্ত প্রতীক রূপে পূজা করা হয়। ভারতবর্ষে শিব বিভিন্ন নামে পূজিত হন। এদের মধ্যে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ বিখ্যাত। জ্যোতির্লিঙ্গগুলির প্রতিটির আকার ও ইতিহাসের দিক থেকে স্বকীয়তা বিদ্যমান।

'শিব ভক্তি' ভারতবর্ষকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে একসূত্রে বেঁধেছে। ভাষা-মত-পরিধান ও আচারের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভক্তি অখণ্ড ভারতবর্ষে ঐক্যের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছে যা হাজার বছর বৈদেশিক আক্রমণ সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত প্রবহমান। নতুন নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে আজ আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিবলিঙ্গের খোঁজ পাচ্ছি যা সারা বিশ্বে সনাতন ধর্মের ব্যাপ্তিকে প্রমাণ করে। ভিয়েতনামে চতুর্থ শতাব্দীর, ইন্দোনেশিয়াতে পঞ্চদশ শতাব্দীর, রোমের ভ্যাটিকান সিটিতে সপ্তম শতাব্দীর, আফ্রিকাতে ৪০০০ বছর আগেকার এবং ভারতের হরপ্পায় ৫০০০ বছরের পুরনো শিবলিঙ্গ 'মহাকাল'-এর অনন্ত, শাশ্বত রূপের পরিচয় দেয়।

ইউরোপীয় পরমাণু গবেষণা সংস্থা 'সার্ন'-এর কেন্দ্রে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-এর দেবতা তাণ্ডবনৃত্যরত 'নটরাজ' মূর্তি বসানো হয়েছে যা সৃষ্টিতত্ত্বের খোঁজে সনাতন ধর্মের দর্শনকেই স্বীকৃতি দেয়। অর্থাৎ শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান-সহ এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে 'শিব' প্রাসঙ্গিক নন। যুক্তি-ভক্তি-আস্থা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি শিবময়। □

দোলে কল্যাণী ঘোষপাড়ায় সতীমায়ের মেলা

সপ্তর্ষি ঘোষ

দোলপূর্ণিমায় কল্যাণী ঘোষপাড়ায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বাৎসরিক উৎসব ও মেলা--- ঘোষপাড়ার মেলা বা সতীমার মেলা বঙ্গের বৃহৎ মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। মেলায় মশায়গণ (গুরু) নিজ নিজ আসনে বসেন এবং ভক্তগণ সেখানে দোল উদ্‌যাপন করেন। আম ও লিচুগাছতলায় নিজ নিজ আখড়ায় ভক্তদের তিনদিন ব্যাপী ভাবের গান পরিবেশন হিমসাগরে স্নান, ডালিমতলায় ও মায়ের মন্দিরে মানত করা। আগে এই মেলা সাতদিন চলত, এখন তিনদিন চলে। এই মেলায় হিন্দু, মুসলমান, উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর মানুষের সমাগম। মেলায় একসঙ্গে বসে খাওয়া প্রধান কর্তব্য বলে ধরা হয়। মেলা সম্বন্ধে নদীয়ার প্রাক্তন মহকুমা শাসক কবি নবীনচন্দ্র সেন বলেছিলেন, 'ঘোষপাড়ার মেলায় সকল জাতির সমাগম। ঘোষপাড়া কর্তাভজাদের শ্রীক্ষেত্র।' বাগানের মধ্যে রাস্তার দু'ধারে মেলা বসে। নাগরদোলা, সার্কাস, হোটেল, বড়ো বড়ো মিষ্টির দোকান প্রভৃতির বেচা-কেনা বেশ রমরমিয়ে চলে। খইয়ের তৈরি 'খইচুর' এখানকার এক বিশেষ মিষ্টি। সম্প্রতি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় মেলার জায়গায় প্রাচীর তুলে দেওয়ায় মেলার স্থান অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়েছে। তবুও মেলার জাঁকজমক বিন্দুমাত্র কমেনি। বহু কীর্তনের দল দোলের দিন ডালিমতলায় ও মায়ের মন্দিরে কীর্তন পরিবেশন করে। মেলায় রং খেলা হয় না, আবির বা ফাগ খেলা হয়। মেলার আগের দিন চাঁচর। মেলা প্রাঙ্গণ সারারাত ভাবের গীত ও বাউল গানে মুখরিত থাকে। বিভিন্ন স্থান থেকে বাউলরা এই মেলায় যোগদান করে এবং বাউলগানে মাতিয়ে তোলে। ভোরে দেবদোল ও মায়ের পূজা হয়। সতীমা ছিলেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মা-সতীমা। হিন্দু মুসলমান সকলেই আসেন, কোনো বিভেদ নেই।

ডালিমতলা

ঘোষপাড়ায় সতীমার মন্দিরের বাইরে একটি ডালিম গাছ আছে। গাছটির কোন্‌টা মূল শিকড় তা জানা যায় না। অনেকগুলি গুড়ি আছে। সতীমার মেলায় পুণ্যার্থীরা হিমসাগরে স্নান করে ডালিমতলায় মানত করেন। ডালিম গাছে ঢিল বেঁধে ভক্তরা মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য নিবেদন করেন তাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি। লালন ফকির তাঁর গানে বলেছেন—

লালন কয় তোর মনকে খাঁটি
ডালিমতলার নিয়ে মাটি
হারাস যদি হাতের লাঠি
পড়বি খানা আর ডোবাতে।

ডালিমতলার মাটিতে রোগ নিরাময় হয়। শোনা যায়, এই ডালিমতলার মাটি নিয়ে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আউলচাঁদ এক কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করেছিলেন। এই ডালিমতলায় সতীমা সিদ্ধিলাভ করেন। ডালিমতলায় মানত করলে মনোবাসনা পূর্ণ হয়। বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্ন স্থান থেকে আসেন এবং ডালিম গাছে মানত করেন। রোগ মুক্তির জন্য বহু ভক্ত ডালিমতলার মাটি বাড়ি নিয়ে যান। প্রশাসন থেকে ডালিম গাছের চারধার লোহার গ্রিল দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হিমসাগর

সতীমার মন্দিরের আর একটি পুণ্যস্থান হিমসাগর। এটি একটি বড়ো পুকুর বা সায়রের মতো। হিমসাগরে স্নান করে বহু ভক্ত ব্যাধিমুক্ত হয় এবং তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায় হিমসাগরের মহিলা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বহু ভক্ত হিমসাগরের জল বাড়ি নিয়ে যান রোগ মুক্তির জন্য। অনেকে হিমসাগর থেকে স্নান করে সিক্ত বসনে মন্দির পর্যন্ত দণ্ডি কাটেন। হিমসাগরে স্নান করলে বোবার বোল ফোটে এবং অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। বিষয়গুলি এখনো লোক মুখে ফেরে। মেলার সময় হিমসাগরে জল কম থাকে। এই জলে স্নান করে অসংখ্য মানুষ পূজা দেন।

একটি প্রবাদ আছে—

এক মনে এক প্রাণে আসিলে হেথায়
দুরারোগ্য রোগ হয় আরোগ্য ত্বরায়।

সাধারণ মানুষের অনেক দুঃখ কষ্ট। বিপদগ্রস্ত মানুষকে বিপদমুক্ত করেছিলেন সতীমা। তাই আজও অগণিত মানুষ আসেন সতীমার কাছে বিপদমুক্ত হতে। তাই সতীমা আপামর মানুষের আপনজন। সতীমার জয়ধ্বনিতে দোলের দিন মুখরিত হয়ে ওঠে মেলাপ্রাঙ্গণ।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. সতীমা ও কর্তাভজা সম্প্রদায়— সত্যশিব পাল মোহান্ত। ২. এই বাংলায় (২য় খণ্ড)— প্রণবেশ চক্রবর্তী। ৩. সতীমা ও সহজ তত্ত্ব— অমিয় কুমার সাউ। □

ফাগুনের মেঘ আকাশ

মৌ চৌধুরী

এই মাঝ ফাগুনের আকাশে অকারণেই ঘন মেঘের আস্তরণ দেখে কিছুটা থমকে গেল মেধা। ফাগুনের এই মন পাগল করা বাউড়ি সময়টা এলেই অজানা টানে হারিয়ে যেতে থাকে সব কিছু। এই সময়গুলো যেন পঁচিশ বছরেরও আগের জীবন রূপকল্পনায় ফিরে আসে ওর কাছে। যেন সেই অল্প বয়েসের মেধার হৃদয়ের কষ্ট নদী হয়ে বয়ে যাচ্ছিল বুকের ভেতর। পাথরে পাথরে ধাক্কা মেরে চলা জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দটা বড্ডো স্পষ্ট হয়ে কানের পর্দায় বাজছিল। হঠাৎ ছন্দপতন, টেবিলে রাখা মুঠো ফোনটা বেজে উঠলো। ফোনের পর্দায় বন্ধু গার্গীর নামটা ভেসে উঠলো। মেধা ফোনটা অন করে হ্যালো বলার আগেই গার্গী বলে উঠল— শোন মেধা, আমাদের যাওয়ার দিনটা রবিবার নয়, বুধবার ঠিক হয়েছে কিন্তু। তোর তো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আর শোন, কুহেলি যাবে না তাই আমরা পাঁচজন হলাম। আর শোন মনমিতার সঙ্গে কিন্তু হয়তো ও আর ওর হাজব্যান্ড যাবেন। আর আমাদের হাফ বন্ধু গড়িয়ার শ্বেতা একাই যাবে। বাকিদের সঙ্গে তো ডেস্টিনেশনে গিয়েই দেখা হবে। আর শোন সকাল সাতটা মনে রাখিস কিন্তু। প্রতি কথার আগে 'আর শোন' বলাটা গার্গীর মুদ্রাদোষ।

মেধা এবার গার্গীকে থামালো জোর করে, বলল কীরে তুই আমাকে কিছু বলতে দে, সবই যদি তুই বলিস আমি কী বলি বলতো। গার্গী বলল, কী বলবি বল। আর তোর গলাটা এমন ভারী শোনাচ্ছে কেন রে। মেধা অস্পষ্ট গলায় জানালো, আমায় এবার বাদ দে। আমি যেতে পারব না। পরের প্রোগ্রামে নিশ্চয়ই যাব। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে গার্গী প্রায় চিৎকার করে উঠল, তুই আর কত ন্যাকামো করবি রে, বয়েসটা তো কম হলো না। কত আর খুকি সাজবি বলতো। মেধা গলা নামালো, গার্গী এবার স্বাভাবিক হ'। রাগের মাথায় কীসব ভাষা বের হচ্ছে তোর। কী হচ্ছে রে? কী ভাষা তোর মুখে চুপ কর। গার্গী চিৎকার করে উঠল, চুপ কর আমাকে ভাষা শেখাবি না। কেন শান্তিনিকেতন যাচ্ছি ভালো করেই জানিস। দুই বন্ধুর উচ্চস্বর যেন কলেজ জীবনের রাস্তায় চলে গিয়েছিল। এরই মাকে মেধার স্বামী দেবাদিত্য স্নান সেরে বাইরের পোশাকেড্রইং রুমে এলো। কিছুটা বিরক্ত হয়ে মেধাকে বলল আর কতক্ষণ বসে থাকবে। সকাল থেকে তো ফোন নিয়ে চলছেই, এবার তো খেতে দাও।

গার্গীর সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে অতীতে চলে যাচ্ছিল মেধা। এক মুহূর্তে ও অতীত থেকে বাস্তবের মাটিতে আছড়ে পড়ল। বিয়ের পর থেকেই দেবাদিত্যের সঙ্গে মন মানসিকতা কোনো কিছুতেই মেলে না। মানসিক ভাবে দু'জনের যেন বিস্তর ফারাক। মেধা জানে এই ফারাকটা ওই করেছে। মেধা ফোনটা কেটে দিয়ে মন ভার নিয়েই দেবাদিত্যকে খেতে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। দুপুরে খেতেও ইচ্ছে হলো না। দেবাদিত্য স্বামী হিসেবে অসাধারণ। কোনো ত্রুটি নেই। কিন্তু মেধা নিজেই কেমন দূরে থাকে। প্রথমদিকে দেবাদিত্য অনেক চেষ্টা করেছে স্বাভাবিক জীবনযাপনের কিন্তু মেধা পারেনি। এখন দুজনে একঘরে থেকেও দূরের বাসিন্দা। সারাদিন এক রকম না খেয়েই কাটল মেধার।

সেই কবে স্কুল ছেড়ে আসা বন্ধুদের নিয়ে মোবাইলে একটা গ্রুপ আছে। এই গ্রুপটা কে শুরু করেছিল মনে নেই মেধার। তবে স্কুলের বন্ধুদের কাছে খুব জনপ্রিয়। সবাই সবার খোঁজখবর রাখে। অনেকে মিলে বেড়াতে যায়। পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া-আসা চলে। কথা ছিল এবারের দোলে স্কুলের বন্ধুদের গ্রুপের সবাই মিলে শান্তিনিকেতনে

বেড়াতে যাবে। ফেরার পথে মায়াপুর হয়ে কলকাতায় ফিরে আসবে। প্রস্তাবটা গার্গী দিয়েছিল। অনেকেই জানত শান্তিনিকেতনে ওর মামাবাড়ি। আরও বেশি জানত মেধা। বন্ধুদের মধ্যে কুহেলির অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই ভালো। ওর স্বামী প্রমোটিং ছাড়াও অনেক ধরনের ব্যবসা করে। মেধাদের বন্ধুরা কোথাও বেড়াতে গেলে কুহেলি অনেকটাই প্রমোট করে। যদিও ব্যাপারটা বন্ধুদের অনেকেই পছন্দ করে না। এবারে শান্তিনিকেতন বেড়াতে যাওয়া নিয়ে বন্ধুদের সকলের ভেতর আলাদা আনন্দ ছিল। ওদের সবার মধ্যেই একটা আলাদা উত্তেজনা ছিল। কেবল মেধার কাছে ছিল অন্য অনুভূতি। মেধার বন্ধুরা সকলেরই প্রায় পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়েছে। সকলের পুরানো দিনের কথার মধ্যে একটা স্মৃতি মেদুরতা এসে যায়। তবে এই বয়সে এসে মনটাকে কীভাবে একটু আনন্দ দেওয়া যায় সেটাই প্রধান ভাবনার বিষয় এখন সব বন্ধুদের কাছে। রোজকার সমস্যাকে বাদ দিয়ে নিজেকে একটু ভালো লাগায়, ভালো রাখায় নারী-পুরুষ সকলেরই মায়াবী একটা স্মৃতি থাকে। অল্প বয়েসের সব কিছু ভালোলাগার রঙের সঙ্গে ভালোবাসায় শরীর মন দুটোই পরস্পরকে আবেশে রাখে। এই ভালোবাসা সকলের জীবনের অনেকটাই জুড়ে থাকে। হয়তো সারা জীবন।

মেধার জীবনেও এমনই এক মেঘলা ফাগুনে সেই সবুজ সময়ে ভালোবাসা এসেছিল। দীঘল চেহারার খুব মেধাবী ছেলেটির নাম ছিল অরণ্য। ফাগুনে আকাশ মেঘে ভরে এলে অরণ্যের কথা বেদনা হয়ে ভেসে আসে। দেবাদিত্য স্বামী হলেও মেধা মনে করে অরণ্য ওর জীবনের প্রথম ও শেষ ভালোবাসা। জীবনের টানাপোড়েনের মাঝে দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করেছে কিন্তু ভুলে যাওয়া আর হলো না। মেধার বিয়ের পর অরণ্য ভালো চাকরি পেয়ে আমেরিকা চলে গিয়েছে। মাঝে দু' একবার দেশে এলেও মেধার সঙ্গে দেখা হয়নি।

এবারে অনেকদিন পর অরণ্য আমেরিকা থেকে এসেছে। থাকবে শান্তিনিকেতনে নিজেদের বাড়িতে। গার্গীর কাছে ওর মামাতো ভাই অরণ্যর ফিরে আসার খবর পেয়েছিল মেধা। তারপর থেকেই মন উতলা ওর। ব্যথার নদী কুল ছাপিয়ে চলেছে পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়া মেধার। কলেজের শেষ দিকে এই শান্তিনিকেতনেই তো গার্গীর সঙ্গে বেড়াতে এসে অরণ্যকে প্রথম দেখা ওর। তারপর কেমন করে যেন স্বপ্নময় হয়ে গিয়েছিল সব কিছু। সেবারে দোলের দিনে ছিল এমনই মেঘভরা আকাশ। লাল পলাশের পাপড়িতে লেগেছিল বৃষ্টির ছিটেফোঁটা। অরণ্যর হাত দিয়ে লাল হলুদ সবুজ রং মেশানো আবিরে ভরে ছিল মেধার সব চুল মুখ আর শরীরের অনেকটা। মনে আছে অন্য কোনো এক ভালোলাগায় কাঁপছিল মেধা। অরণ্য তার রং মাখা হাত মেধার হাতে রেখে ছোট্ট একটা কথায় অন্য পৃথিবীর গল্প শুনিয়েছিল। ভালোবাসার কথায় সুখে খুশিতে মন ভরে গিয়েছিল মেধার। কাছে শিমুল গাছে হয়তো ডেকেছিল বসন্তবাউড়ি। তারপর অনেক কটা দিন একসঙ্গে কাটানো। সাইকেলে করে কোপাই নদী, আরও দূরে কোথাও হারিয়ে যাওয়া। অনেক স্বপ্নসুখের কথা। সেই অরণ্য ফিরে এসেছে রং ছড়ানো বসন্ত আবেশের শান্তিনিকেতনে। মেধা একা বসে ভাবে কেমন করে আবার এমন দিনে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে।

ঠিক হয়েছিল এবার শুধু বন্ধুরাই যাবে। তখনও মেধা জানত না অরণ্য এসেছে। সে এসেছে শোনার পর মেধার মন যেন সায় দিচ্ছে না। যদি যায় তবে মেধা হিসাব করে দেখেছে ছাব্বিশ বছর চার মাস এগারো দিন পরে দেখা হবে। দু'জনেই তো কত বদলে গিয়েছে। মেধা জানে অরণ্য বিয়ে করেনি। গার্গী বলেছে, তোর জন্যেই আমার দাদাটা সারা জীবন অবিবাহিত থেকে গেল। তোর ভালোবাসার আগুনে দাদার জীবনটা পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছে। তুই তো ভালোই বিয়ে করে ঘর-সংসার করছিস। এবারে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে যাওয়ার কথাটা প্রথম গার্গী বলেছিল। পরে ও একান্তে মেধাকে বলেছিল, দাদা একবার তোকে দেখতে চায়। আপত্তি করেছিল মেধা। কেন এই আপত্তি তার কারণও জানা ছিল না মেধার। গার্গী বুঝিয়েছিল, তোকে একবার দেখতে চাওয়াটাও কি অপরাধ বল। দিন কোথায় চলে গিয়েছে। সব কিছুই তো বদলে গিয়েছে। মামা-মামি কেউ আজ বেঁচে নেই, ঘরবাড়ি সব পড়ে আছে। জানি না দাদা চলে যাবে নাকি এবারে থিতু হবে। জানতে চাইলে কিছুই বলে না। গার্গী বলে, দাদা একবারই ফোন করে আমাকে বলেছিল সম্ভব হলে মেধাকে নিয়ে আয়। সেই জন্যই যাওয়া। দাদা কিন্তু জোর করেনি।

নিজের ঘরে শুয়ে শূন্য মন নিয়ে ভাবে সেই বসন্তবাউড়ি ডাকা জায়গায় যদি আবার একবার দুজন দুজনের হাত ধরে দাঁড়ায়। হাতে কি রং থাকবে নাকি শূন্যই থেকে যাবে! অনেকেই ভাবে মেধা ইচ্ছে করে অরণ্যকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আসলে তা নয়। সংসারে এক উদাসী বাউল মেধাও। সে নিজে জানে কেন সে মাতৃত্বের স্বাদ নেয়নি। অরণ্য কি একাই স্বজন হারানো মানুষ!

এই ফাল্গুন মাস পড়লে শূন্যে তাকালে মন কেমন পাগল পাগল লাগে। ভালোবাসার আগুন মনে জ্বালিয়ে পুরো ছারখার করে দেয় ধরাকে। পলাশের রঙের আগুন আর মহুয়ার গন্ধ আকুল করা চারপাশ পুড়িয়ে দেয় বনভূমি। রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়। হৃদয়ও বয়সের কাছে তুচ্ছ, বুকের ভেতর ও বাইরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে। প্রাণ ভরিয়ে দিতে চায় মন। মেধা ভাবে অরণ্যর মধ্যেও কি এই অনুভব কাজ করে! এই শেষবেলায় এসে যদি দেখা হয় তাতে শিমুল-পলাশের কী। আমি মেধা আর তুমি অরণ্য এই পবিত্র আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়ে গিয়েছি। তোমার হাতের অনেক রঙের আবির আমার দেহ মন রাঙিয়ে রেখেছে। যাবার আগে শেষবারের মতো আরও একবার আবীরে আমার শরীর শিক্ত করলে দূরে সরে যাবে কি ভালোবাসা?

মেধা এসব ভাবতে ভাবতে কি ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখছিল? তন্দ্রার ঘোরের মধ্যেই হঠাৎ শরীরে হালকা স্পর্শ পেল। অনেক দূর থেকে যেন দেবাদিত্য বলছে, উঠে পড়ো বিকেল হয়ে গিয়েছে খাবে কখন? কথা বলছ না যে! দেবাদিত্য এবার স্নেহের ছোঁয়ায় মেধার মাথায় হাত রাখে, কোনো সাড়া নেই। আপন মনেই দেবাদিত্য বিড়বিড় করে ওঠে, এবার শান্তিনিকেতন যাওয়া নিয়ে এমন মেতে উঠেছিল কেন কে জানে। এত ছেলেমানুষের মতো আচরণ করতে আগে তো দেখিনি কখনো! তারপর কেনই-বা এত গম্ভীর হয়ে গেলে কোনো কিনারাই পাই না। আবার ওবেলায় শুনলাম ফোনে কাকে বলছ যাবে না। ঘুমিয়ে থাকা সেই কতদিন আগের নিজের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকা দেবাদিত্য ভাবছিল একঘরে বাস করলেও সারাজীবন কেন এত দূরে থেকে গেলে। কত চেষ্টা করেও এতদিনেও তোমার তল পেলাম না।

মেধা কি স্বপ্ন দেখছিল? ফাগুনের আকাশ ভরা মেঘের নীচে জানালা দিয়ে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে বসন্তবাউড়ি ডাকা শিমুল গাছটি, আর আরও দূরে অজানায় গেলে কি পাবে ভালোবাসা? □

এক শালিক, দুই শালিক

নিখিল চিত্রকর

আজ সকাল সকাল এক শালিক দেখেছে সৌমিলী। তখন থেকেই মন বলছিল দিনটা খারাপ যাবে। হলোও তাই। চা খেতে বসে রাজীবের সঙ্গে সামান্য কথা কাটাকাটি। ব্যস্, অমনি উঠে গিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলেন বাবু। কাপের চা কাপেই পড়ে রইল। এখন সেদিকে তাকিয়েই গ্যাঁট হয়ে বসে আছে সৌমিলী। কী যেন বলেছে সে রাজীবকে। এভাবে চেঁচামেচি করে পাঁচকথা শুনিয়ে দিল। আজকে আবার শনিবার। রাজীবের প্রোজেক্ট ডেলিভারি কনফারেন্স আছে। ফিরতে কত রাত করবে কে জানে।

দুপুর ৩টে গড়িয়েছে। ড্রইংরুমে বসে টিভিতে একটা ওয়েবসিরিজ দেখছে সৌমিলী। মনটা বড়ো অস্থির। সাতসকালে রাজীবকে ওর পরিবার নিয়ে ওইভাবে বলা বোধহয় উচিত হয়নি। ওদের যৌথ পরিবার। আজকের দিনে এমন একান্নবর্তী পরিবারের দেখা মেলা ভার। চারবছর আগে শুধুমাত্র সৌমিলীর জন্যই শিমলের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে কসবার ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাটে এসে

উঠেছে রাজীব। মাঝে মাঝেই অফিস থেকে বেরিয়ে ওবাড়িতে চলে যায়। ও যাতায়াত করলেও সৌমিলী সেই থেকে আর শ্বশুরবাড়ির চৌকাঠ মাড়াতে চায় না। এমনকী উৎসব-পার্বণের দিনগুলোতেও নানারকম ছুতোনাতা করে কাটিয়ে দেয়। বাধ্য হয়ে রাজীবও উৎসবের দিনগুলোয় পরিবারের সঙ্গে যোগ দেয় না। তার জন্য বেশিরভাগ সময়েই মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয় তাকে। সৌমিলীও জানে একমাত্র তার জন্যই পূজা-আচ্চার দিনে নিজের বাড়িতে যায় না রাজীব। এতো তার বেশ ভালোই লাগে। এবার পূজায় বহু বছর পর রাজীবের পিয়া মাসিমণি অস্ট্রেলিয়া থেকে আসছেন। মনে হয় সঙ্গে মেঘা ও পাপড়িও আসবে। মেঘা ও পাপড়ি মাসিমণির দুই মেয়ে। দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। ওদের বর ও ছেলে-মেয়েরাও হয়তো আসছে। রাজীবের ইচ্ছে এবারের পূজায় সৌমিলীকে নিয়ে শিমলের বাড়িতেই কাটাবে। বহুদিন পর মাসিমণি আসছেন পূজাতে। কটা দিনের ব্যাপার। মিষ্টু নিশ্চয়ই রাজি হবে।

সকালে চা খেতে খেতে সেকথাই বলছিল রাজীব। 'বুঝলে মিষ্টু, ছোটোবেলায় পূজার দিনগুলোতে পাপড়ি, মেঘারা এলে খুব মজা হতো জানো। হইহই করে দিনগুলো কেটে যেত। মেসোমণি ফরেন সার্ভিসের অফার পেয়ে অস্ট্রেলিয়া চলে গেলেন। সেই থেকে ওরা ওখানেই সেট্‌লড। ভিডিয়োকলে কথা হয় ঠিকই কিন্তু সাক্ষাৎ তো আর হয় না। তাছাড়া ভিডিয়োকলে তো আর জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যায় না! চলো না মিষ্টু, কটা দিন ধুমধাম করে কাটিয়ে আসি। একটেরে ফ্ল্যাট আর অফিসের কাজে হাঁপিয়ে উঠেছি। কত বছর সবার সঙ্গে বসে, পাতপেড়ে অষ্টমীর দুপুরে লুচি, ছানার ডালনা, ছোলার ডাল খাওয়া হয়নি।'

সৌমিলী প্রথমটায় চুপ করেছিল। কোনো কথা বলেনি। রাজীব জানে, শ্বশুরবাড়ির লোকজনেদের নিয়ে সৌমিলীর অভিজ্ঞতা তেমন মধুর নয়। ওবাড়িতে যাওয়ার প্রসঙ্গ উঠলেই সৌমিলী এড়িয়ে যায়। সেসব জেনেও আজ একটু মরিয়া হয়েই শিমলের বাড়িতে যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করছিল রাজীব। নিজেকে আর সামলাতে না পেরে সৌমিলী বলেই ফেলল, 'ওই রাবণের গুষ্টির অনুষ্ঠানে তুমি যাও। যতদিন ইচ্ছে থাকো না। আমায় নাই-ই-বা জড়ালে।'

কথা শেষ না হতেই চোয়াল শক্ত করে উঠে পড়েছিল রাজীব। স্নান সেরে, তৈরি হয়েই বেরিয়ে গেছে। মুখে কুটোটা কাটেনি। অন্যদিন লাঞ্চের আগে ফোন করে। আজ করেনি। করবেও না। রাজীব ভীষণ একবগ্‌গা। নিজের ওপরেই খুব রাগ হচ্ছে সৌমিলীর। মাথা নেড়ে মনে মনে বলল, 'নাঃ, এভাবে মানুষটাকে আঘাত দেওয়া ঠিক হয়নি। রাজীবের নিজের পরিবারের প্রতি টান থাকাটা খুব স্বাভাবিক। আমি তো পরের মেয়ে। আমার যে একেবারেই ওদের সঙ্গ ভালো লাগে না। তাছাড়া আমি তো ওর যাওয়াতে কোনোদিন বাধা দিইনি।' সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে টেবিলে রাখা শো-পিসগুলো ঝাড়াঝাড়ি করতে শুরু করল সৌমিলী। পুজোর আর মাত্র দেড়মাস বাকি। গ্যাংটক যাওয়ার প্ল্যানটাও ডিসকাস করা হলো না। একটা ফোন করবো? কিছু খেলো কিনা জিজ্ঞাসা করবো? নাঃ! রাজীব খুব চাপা স্বভাবের। রেগে গেলে গুম হয়ে থাকে। সকাল থেকে ওর নিজেরও তো কিছু খাওয়া হয়নি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো সৌমিলী। পর্দা সরিয়ে পাঁচতলার জানলা দিয়ে চলমান শহরের দিকে তাকালো। পূজা আসছে। দূরের পেল্লাই শপিং মলটার সামনে লোকারণ্য। বেশিরভাগই জোড়া জোড়া অল্পবয়েসি ছেলে-মেয়ে। বিজ্ঞাপনী সংস্থার হোর্ডিঙে রঙিন হয়ে উঠছে তিলোত্তমা। কয়েকটা শপিং ব্যাগ হাতে পার্কিং লটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে একটা লোক। পেছনে মায়ের সঙ্গে ফ্রক পরা ছোটো একটা মেয়ে। নিজের মেয়েবেলার কথা মনে পড়ে গেল সৌমিলীর। সানিপার্কের মস্ত ফ্ল্যাটে ওদের তিনজনের পরিবার। বাবা প্রত্যুষ রায় ছিলেন চিকিৎসক। মা গৃহবধূ। আর সে ছিল বাবার আদরের মিষ্টু। রাজীবও এ নামেই ডাকে। ছোটোবেলা থেকে একা থাকাই অভ্যেস সৌমিলীর। ভিড় তার ভালো লাগে না।

এমএ করার পরই সম্পন্ন ব্যবসায়ী পরিবারে বিয়ে হয়ে গেল। তবে সে বিয়ে টিকল না। মদের নেশায় বুঁদ স্বামী সৌমিলীর ওপর অত্যাচার করত। গায়ে হাত তুলত। শ্বশুরবাড়ির যৌথ পরিবার। ভাশুর, দেওর, জা, তাদের ছেলে-মেয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ি সারাক্ষণ একেবারে গমগম করছে। অথচ একজনও বাড়ির মেজোছেলেকে তার কুকীর্তির জন্য শাসন করত না বা প্রতিবাদ করত না। উলটে আত্মীয়স্বজন এমনকী সৌমিলীর বাড়িতেও নিজের ছেলের কোলে ঝোল টেনে কথা বলেছে। ছেলে সুখী না হওয়ার জন্য দোষারোপ করেছে সৌমিলীকেই। এই ঝামেলার জেরেই বাবা-মায়ের কাছে সৌমিলীর ফিরে আসা এবং ডিভোর্স।

এর কিছুদিন পরেই হঠাৎ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে পৃথিবীর মায়া কাটালেন বাবা। মা-ও একটু একটু করে ভেঙ্গে পড়ছিলেন। তিনি সৌমিলীকে আবার বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে থাকলেন। ততদিনে বিয়ে শব্দবন্ধটাই সৌমিলীর কাছে যেন একটা আতঙ্ক। দমবন্ধ পরিস্থিতি কাটাতে একটা প্রাইভেট কলেজে পড়ানোর চাকরি নিল সে। সেখানেই আলাপ রাজীবের সঙ্গে। কলেজে সফট্‌ওয়্যার সংক্রান্ত গোলমাল সারাতে কোম্পানির তরফ থেকে পাঠানো হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ার রাজীব বসুকে। গণ্ডগোলটা হয় সৌমিলীর ল্যাপটপ থেকেই। সমস্যা মিটেছিল। কথায় কথায় সৌমিলীর মোবাইল নম্বরটা চেয়ে নিয়েছিল রাজীব। প্রথমে ফোনে কথাবার্তা। তারপর মেলামেশা। সবকিছুই খুব দ্রুত এবং ঘনঘন চলতে থাকে। দোলের দিন বাইপাসের ধারে একটা ক্যাফেতে রাজীব-সৌমিলীর প্রথম ডেটিং। সেদিন আপাতমস্তক রং মেখে এসেছিল রাজীব। বলেছিল ওদের বড়ো পরিবার। দোলের দিন একসঙ্গে মিলে সবাই রং খেলে। দারুণ

হইচই হয়। নানা রঙের লেপন দেওয়া মুখটা দেখে রাজীবকে সেদিন প্রথমে চিনতেই পারেনি সে। তারপর তো তার সেকি হাসি। থামতেই চায় না।

অনেকদিন পর এমন প্রাণ খুলে হেসেছিল সৌমিলী। নানা কথায় ঘণ্টাতিনেক সময় কীভাবে যে কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিল টের পায়নি ওরা। সৌমিলী ওর প্রথম বিয়ের সবটা অকপটে উজাড় করে দিয়েছিল সেদিন। তা শুনে পিছিয়ে যায়নি রাজীব। আরও কিছুদিন মেলামেশার পর বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। এক কনে দেখা সন্ধ্যায় প্রিন্সেপ ঘাটে সৌমিলীর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে রাজীব বলেছিল— 'চারদিনের মনুষ্যজীবন তো ঘটনাবহুল। তোমার ব্যাপারটাও একটা ঘটনামাত্র। কতজনের জীবনে আকছার এরকম ঘটছে। তা বলে কি সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে বসে থাকতে হবে? জীবনটাকে বড়ো করে দেখো সৌমিলী, দেখবে অতীতের তিক্ততা সেখানে একটা গণ্ডিতে সীমিত হয়ে আছে। কচুপাতায় জলের মতো। ভয় পেয়ো না। আমি সব সময় তোমার পাশে থাকব।'

কথা রেখেছে রাজীব। বিয়ের কয়েকদিন পরই ব্যাটারড ওম্যান সিনড্রোম দেখা দিল সৌমিলীর। যার জেরে এক মাঝরাতে আচমকা ঘুমন্ত রাজীবের গালে উপর্যুপরি কিল-চড় মারতে থাকে সে। হতবাক রাজীব কোনোভাবে নিরস্ত করে তাকে। কিছুদিন পর আবার একই ঘটনা ঘটালো সৌমিলী। তার দু'চারদিন পর আবার। জানাজানি হতে পাঁচজনে পাঁচরকম বাজেকথা বলতে শুরু করল।

সৌমিলীকে নিয়ে রাজীব ছুটল পরিচিত এক সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। ওষুধপত্রের সঙ্গে কাউন্সেলিং চলল টানা ছ'মাস। একটু ধাতস্থ হতেই সৌমিলীর মাতৃবিয়োগ হলো। মাকে হারিয়ে আরও হতাশ হয়ে পড়ল সৌমিলী। সব ঝড় একাহাতে সামাল দিয়েছে রাজীব। নিজের পরিবারের লোকেরাই ট্যারা কথা বলতে ছাড়েনি। পাড়াপড়শিরা তো কোন্ ছার। পুরোপুরি সুস্থ হবার পরেও সৌমিলীর মনে হতো সবাই তাকে নিয়ে অকথা-কুকথা বলছে, মশকরা করছে। অতবড়ো বাড়িতে সারাদিন নিজেকে ঘরবন্দি করে রাখত। তাছাড়া তাদের বিয়েতে এ বাড়ির অনেকেরই আপত্তি ছিল। কিন্তু রাজীব সেসব আমল দেয়নি। শুরু থেকেই সৌমিলীর পক্ষ নিয়েছে। এভাবেই বিয়ের দেড় বছর কেটে গেল।

একদিন অফিস থেকে ফিরে রাঙাপিসির মুখে রাজীবকে শুনতে হলো— একটা ধিঙ্গি, রাক্ষুসী, বাঁজা, বর-পেটানো বউ আমাদের রাজীবের জীবনটাকে শেষ করে দিচ্ছে। এই জন্যই প্রথম বিয়ে টেকেনি ইত্যাদি। এসব শোনার পর সিদ্ধান্ত নিতে দু'বার ভাবেনি রাজীব। পৈতৃকবাড়ির মায়া কাটিয়ে সৌমিলীকে নিয়ে আলাদা সংসার পেতেছে। পরিবারের জন্য মানুষটা কতটা কষ্ট পায়, সৌমিলী তা জানে। সেসব ভেবেই সে সুস্থ হওয়ার পর বহুবার শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যেতে চেয়েছে, কিন্তু রাজীব সায় দেয়নি। বলেছে, 'যেখানে তোমার অসম্মান হয়, সেখানে তোমার যাওয়ার কোনো দরকার নেই। এসবের জন্য নিজেকে দোষী ভেবো না। হ্যাঁ, ও বাড়ির ছেলে হিসেবে আমার কর্তব্যটুকু আমি ঝেড়ে ফেলতে পারি না। মাঝে মাঝে গিয়ে বাবা-মায়ের হাতে প্রাপ্যটা ঠিক দিয়ে আসব।'

আজ প্রায় পাঁচবছর হতে চলল মানুষটা একরকমই আছে। তার ভালোবাসায় এতটুকুও মরচে ধরেনি। সৌমিলীর কষ্ট হয় এটা ভেবে, যে সে রাজীবকে পিতৃত্বের সুখটুকু দিতে পারেনি। সাইকিয়াট্রিস্ট বলেছে, আরও একটু সময় নিতে। তাছাড়া রাজীবের গায়ে হাত তোলার ঘটনা ভাবলে ওর নিজের ওপরেই খুব ঘেন্না হয়। এটাও তো ঠিক, রাজীবের পরিবার থেকে দূরে থাকার কারণ তো ও নিজেই। আজও শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার কথা ভাবলে ভয়ে কাঁটা হয়ে যায় সৌমিলী। বুকের ওপর চেপে বসা পাথরটা আরও ভারী হয়ে আসে।

আজ চতুর্থী। আগামীকাল ওদের গ্যাংটক যাওয়ার কথা। সকালে উঠে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে বারান্দায় চুল আঁচড়াতে গিয়ে সৌমিলীর চোখে পড়লো, উলটো দিকের ফুটপাথে দুটো শালিক এক পা, দু পা করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সকাল-সকাল দু' শালিক দেখে মন ভালো হয়ে গেল। পেছনে ফিরে দেখল, রাজীব এসে দাঁড়িয়েছে। সৌমিলী বলল :

—এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়লে যে।

আনমনা হয়ে রাজীব বলল,

—গ্যাংটকে কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা। গরম জামাগুলো দেখে নিতে হবে। ভাবলাম গোছগাছ করতে তোমায় একটু হেল্প করে দিই।

—হুম্। গোছগাছ তো করতেই হবে। পঞ্চমী থেকে একেবারে দশমী পর্যন্ত থাকা। আচ্ছা শোনো, আজ অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। কিছু শপিং বাকি আছে।

—আরও! এই তো একগাদা কিনলে।

—যা রে! এতবছর পর শ্বশুরবাড়িতে খালি হাতে যাব? তুমি কী গো।

—মানে? আমরা তো কাল ভোরেই বেরিয়ে যাচ্ছি। ওবাড়িতে যাওয়ার সময় কোথায়? (অবাক হলো রাজীব)

রাজীবের অনেকটা কাছে ঘেঁষে গিয়ে তার চুল বিলি কেটে সৌমিলী বলল—

—শোনো, সব প্ল্যান করা হয়ে গেছে। আজ ওবাড়ির সবার জন্য কেনাকাটা করব। কাল সক্কাল-সক্কাল পৌঁছে যাব আমার শ্বশুরবাড়িতে। বিকেলে পাপড়ি, মেঘাদের নিয়ে গড়িয়াহাটে যাব। কল করেছিলাম। বলেছে, ওদেরটা ওরাই পছন্দ করে নেবে। প্ল্যানটা কেমন?

—তাহলে গ্যাংটক?

নরম ছোঁয়ায় রাজীবের গালে হাত রেখে সজল চোখে সৌমিলী বলে, 'সেটা ক্যানসেল করে দিও। আমার জন্যই তোমাকে পরিবারের থেকে আলাদা হতে হয়েছে। আমায় ক্ষমা করো।'

রাজীবের বুকে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগল সৌমিলী। স্বামীর আলিঙ্গনে তার বুকের পাথর আজ বুঝি গলে জল হয়ে গেল। □

রঙের পরশ

দুপুরবেলা হনহন করে হেঁটে চলেছেন পরেশকাকা। পেছন পেছন একদল ছেলেও ছুটছে। কারও হাতে পিচকারি, কারও হাতে বেলুন। পরেশকাকা চিৎকার করে বলছেন, আরে কেউ রং দিস না রে, পূজা করতে যাচ্ছি।

কিন্তু কে কার কথা শোনে । সামান্য হলেও রঙের ছিটে পড়লো গায়ে। রেগে গিয়ে একটা লাঠি নিয়ে তেড়ে যেতেই যতীন মুখুজ্জে এসে ধরে ফেলেন তাঁকে, আর ছেলেদেরও বকা দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন।

মুখুজ্জেবাড়ির সামনে একটু দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকেন পরেশ ভট্টাচার্য। যতীনবাবু তাঁকে বারান্দায় ডেকে নিলেন। বাড়ির ভেতর থেকে জল বাতাসা আনালেন। জলটা এক চুমুকে শেষ করে যতীনবাবু বলেন, দেখেছেন এখনকার ছেলেদের ব্যাপার, বলছি পূজা করতে যাচ্ছি তো কেউই কথা শুনতে চাইছে না। রং দিয়েই ছাড়ল।

তা পরেশদা, বলছি কোথায় পূজা আছে?

ওই তো দত্তবাড়িতে। শ্যামসুন্দরের পূজা। কয়েক বছর ধরে আমিই পূজা করছি। কিন্তু এবারে পঞ্জিকাতে বিকালের সময় দিয়েছে, তাই স্নানটান সেরে ভরদুপুরে বেরিয়েছি। তা, এই ছেলেদের এখনও রং খেলা শেষ হয়নি। সেই কতদূর থেকে দৌড় করালো। এই বুড়ো বয়সে ওদের সঙ্গে কী আর পারা যায়! তার মধ্যে রোদটাও কেমন চড়া, দেখছেন তো?

হ্যাঁ, দেখতে দেখতে সত্যিই খুব গরম পড়ে গেল। তবে, আজকে এই দোলের দিনে তো আর কিছু করার নেই, রং দেবেই। ছোটোদের তো এতেই আনন্দ। বরং একটু বসুন, মধ্যাহ্ন ভোজনটা সেরে তারপর না হয় আমার ছোটো ছেলেই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

আরে, না না। ওসবের দরকার নেই। আমি বরং বেরিয়েই পড়ি। আমার জন্য আপনাদের কষ্ট করতে হবে না।

হঠাৎই ছুটতে ছুটতে একটি ছোট্টো মেয়ে যতীনবাবুর পাশে এসে দাঁড়াল। হাতে একটা পিচকারি। গায়ে রং লেগে আছে। কান্নাভরা গলায় কানে কানে কিছু একটা বলল।

কৌতূহলবশত পরেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, মামনি কী বলছে? যতীনবাবু হাসতে হাসতে বলেন, ও আমার নাতনি। ও বলছে, সকাল থেকে রং নিয়ে বসে আছে, এখনো কাউকেই রং দিতে পারেনি। আর এখন ওর মা ওকে বলেছে স্নান করে খেতে বসতে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরেশবাবু মেয়েটিকে ডেকে বললেন, মামনি, তুমি আমাকে রং দেবে?

এক মুহূর্তের মধ্যেই মেয়েটির কান্না উধাও। চোখে একটা চমক খেলে গেল। ঠোঁটের কোণে সুন্দর একটা হাসি দেখা গেল।

যতীনবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তো রঙের ভয়ে পালিয়ে বেরাচ্ছিলেন আর এখনই আবার রং খেলার শখ হলো, কারণটা কী?

বাড়িতে আমার নাতনিও রং দিতে চেয়েছিল কিন্তু রং দিতে দিইনি। কিন্তু ওর মুখটা দেখে আমার সেই নাতনির কথা মনে হলো। মনে হলো বড়ো একটা অন্যায় করে ফেলেছি। পূজা দেওয়ার আগে আবার স্নান করে নেব। কিন্তু ওর ইচ্ছাটা পূরণ করাই মনে হয় আগে দরকার।

যতীনবাবুও হাসতে হাসতে বললেন, তবে তাই-ই হোক।

সকলে বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে এলেন। বাড়ির অন্যরাও যোগ দিল। ছোট্টো মেয়েটি পিচকারি দিয়ে রং ছুঁড়তে লাগল। বাকিরাও কিছুক্ষণ দেখার পর রং খেলা শুরু করল। পরেশবাবু টেবিলের উপর রাখা আবির মেয়েটির গালে লাগিয়ে দিলেন। যতীনবাবু পরেশবাবুর পায়ে আবির দিতে গেলে আটকে দিলেন। দুজন দুজনকে মাথায় আবির মাখিয়ে দিলেন।

যতীনবাবুর বউমা এসে বললেন রং খেলা শেষ করে স্নান করে নিন। রান্না হয়ে গেছে। ঠাকুরমশাইকে কিন্তু না খেয়ে যেতে দিচ্ছি না।

অগত্যা পরেশবাবু স্নান সেরে নিলেন। যতীনবাবুর বড়ো ছেলে একটা নতুন ধুতি আর ফতুয়া দিলেন। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে রওনা হওয়ার পালা। ছোট্টো মেয়েটি নতুন জামা পরে ঘরে ঢুকল।

যতীনবাবু বললেন আজ অনেক বছর পর রং খেললাম। সত্যিই খুব ভালো লাগল। আমার স্নেহা মা তো দারুণ খুশি।

পরেশবাবু বললেন, এখন আসি, আর দেরি করা ঠিক হবে না। স্নেহা মা, আসি , পরে আবার আসব।

যতীনবাবুর ছোটো ছেলে বাইক নিয়ে দরজার সামনে হাজির। পরেশবাবু উঠে বসতেই রওনা হয়ে গেলেন দত্তবাড়ির উদ্দেশে। শ্যামসুন্দরের পুজো দিতে।

সোমকান্তি

জাতীয় উদ্যান

গির

গির জাতীয় উদ্যান গুজরাট রাজ্যের টালালা গিরে অবস্থিত। এই উদ্যান সোমনাথ থেকে ৪৩ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, জুনাগড় থেকে ৬৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং আমরেলি থেকে ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ১৯৬৫ সালে এই বনভূমিকে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়। এই উদ্যানের আয়তন ১৪১২ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে ২৫৮ বর্গকিলোমিটার জাতীয় উদ্যান এবং ১১৬৩ বর্গকিলোমিটার অভয়ারণ্য হিসেবে সুরক্ষিত। এই উদ্যানের প্রধান আকর্ষণ এশিয়ান সিংহ। অন্যান্য জন্তুজানোয়ারের মধ্যে রয়েছে চিতাবাঘ, বন্য শুয়োর, ডোরাকাটা হরিণ, নীলগাই, চিঙ্কারা প্রভৃতি। এই উদ্যান প্রতি বছর ১৬ জুন থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যটকদের জন্য বন্ধ থাকে।

এসো সংস্কৃত শিখি-৫৮

ইকারান্ত-স্ত্রীলিঙ্গে

भवती- भवत्यः (তুমি– তোমরা)
भवती देवी- भवत्यः देव्यः (তুমি বালক)
अभ्यासं कुर्मः--
भवती का: ? - भवत्यः का: ?
(তুমি কে? – তোমরা কে?)
भवती कर्मकरी - भवत्यः कर्मकर्यः।
भवती जननी - भवत्यः जनन्यः।
भवती नर्तकी - भवत्यः नर्तक्यः।
भवान युवती - भवत्यः युवत्यः।
....ममतामयी। ....भवत्य....।
प्रयोगं कुर्मः
महाराज्ञी, साम्राज্ঞী, ভক্তিময়ী, নারী, দাসী, ভগিনী, তরুণী, কিশোরী।

ভালো কথা

আমার মহাকুম্ভমেলা দর্শন

প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভমেলা দেখে এলাম। বাবা অনেক আগেই ট্রেনের টিকিট কেটে রেখেছিলেন। আমরা ওখানে শিবশক্তি সেবা ধাম শিবিরে উঠেছিলাম। আমাদের শিবিরের কাছেই ত্রিবেণী সঙ্গম। পরদিন সকালে আমরা স্নান করলাম। তার পরদিন আবার। লক্ষ লক্ষ মানুষ স্নান করছে। বাবা, মা তো আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন। বিকেলে আমরা একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। কী বিশাল মেলা। কী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এক ফাঁকে আমরা লেটে হনুমান মন্দির, অক্ষয় বট দেখলাম। এত বড়ো মেলা আমি আগে কখনো দেখিনি। ট্রেনে খুব ভিড় ছিল। তবু খুব আনন্দ হয়েছে।

সুবীর বিশ্বাস, অষ্টম শ্রেণী, চাকদহ, নদীয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ন নু অ দ	(১) শ অ ধি ন কা প্র র বে
(২) কা ন্ত ন ল	(২) লা ল খ মু কো হ ত রি

২৪ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর
(১) নলেনগুড় (২) পঞ্চপাণ্ডব

২৪ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর
(১) নরনারায়ণ (২) নয়নাভিরাম

উত্তরদাতার নাম
(১) বর্ণিনী সরকার, বি এস রোড, মালদা। (২) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কল-৪৯।
(৩) অনিশ দাস,গল্ফ গ্রিন, কল- ৯৫। (৪) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

খুঁটি

দেবদাস কুণ্ডু

পঁয়ষট্টি বছরে পা রাখলেন তিনি। চোখের পলকে সময় ছুটে যায় দুরন্ত ট্রেনের মতো। আর ক' বছরই-বা বাঁচবেন তিনি। বড়ো জোর দশ কী পনেরো বছর। পঁয়ষট্টি বছরটা তো কম নয়। খুঁড়লে মেঘের ফাঁক দিয়ে রোদের উঁকি দেবার মতো কত স্মৃতি জেগে উঠবে।

বিছানায় বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে এসব ভাবছিলেন সুমন পাল। ফ্ল্যাটটা তার দোতলায়। তাদের আবাসন কম্পাউন্ডের বাইরে একটা বড়ো বস্তি। নোংরা, টালির চাল। কারও চালে প্লাস্টিক। নিশ্চয় জল পড়ে বর্ষাকালে। একদিকে জল আটকাতে চালে প্লাস্টিক, অন্যদিকে ঘরে পানীয় জলের অভাব। একটা বাড়িতে বাইশটা সংসার। চারজন করে ধরলে অষ্টাশি জন মানুষ। কল মাত্র একটা। জল নিয়ে ঝগড়া বিবাদ তো থাকবেই। একটা সময় তিনি তিরিশটা বছর বস্তিতে জীবন কাটিয়েছেন। বস্তির জীবন যন্ত্রণা তিনি ভালো মতো অনুভব করতে পারেন। এখন তার ফ্ল্যাট-জীবন। তাও কুড়ি বছর হলো ফ্ল্যাটে বসবাস করছেন।

একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। পৌনে দশটা। একটু আগে ঘুম থেকে উঠেছেন। শুতে শুতে ঘড়ির কাঁটা দেড়টা দুটোর ঘরে চলে যায়। গান শোনেন, ফেসবুক দেখেন। ম্যাসেঞ্জার করেন। বই পড়েন। একটু আধটু ডায়েরি লেখেন। কিন্তু দুর্লভ বস্তুর মতো চোখের পাতায় ঘুম নেমে আসতে চায় না সহসা। রোজ খান একটা করে ঘুমের ওষুধ। তবু ঘুম দূর দেশের মেঘের মতো। ধরা দেয় না সহজে। কখনো মনে হয় ঘুম দূর দেশের পাখি। কাছে এসে তার চোখের পাতায় ডানা গুটিয়ে বসে না। কেন তার সঙ্গে ঘুম এতো শত্রুতা করছে? এক সময় তো এই চোখ দুটোয় ঘুমের জোয়ার নেমে আসতো। তখন অদিতি আপেক্ষা করে বলতো, সারাদিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকো। শুলে আর ঘুমিয়ে পড়লে। রাতে একটু গল্প গুজব করবো তার অবসর তোমার নেই। বিয়ে করেছিলে কি শুধু খাওয়া আর ঘুমানোর জন্য? সুমন পাল জোর করে চোখের পাতা খুলে বলতেন, আমার জীবনে তো কোনো গল্প নেই অদিতি। কী গল্প করবো তোমার সঙ্গে?

—তা বললে হবে? গল্প ছাড়া কোনো মানুষের জীবন হয় নাকি? সুখ দুঃখের দুটো কথা তো বলতে পারো?

—সুখ তো নেই। দুঃখের গল্প শুনতে ভালো লাগবে?

—তুমি দুঃখের গল্পই বলো। তবু তো দুটো কথা হবে নিজেদের মধ্যে। সারাদিন তো আমি একাই থাকি। কার সঙ্গে কথা বলবো? সেই লোক কি আছে এখানে?

—আমার দুঃখের কথা তো তুমি জানোই। ছেলেবেলায় মা মারা গেল। উঠে গিয়ে চোখে জলের ছাট দিয়ে এসে বলতে শুরু করতেন— মা তো মারা গেল। বাবা আবার একটা কালো মহিলাকে বিয়ে করে নিয়ে এলেন ঘরে। সৎমা আমাকে ভালোবাসেন না এতটুকু। একটু বড়ো হতে বাবা স্কুল ছাড়িয়ে একটা কারখানায় ঢুকিয়ে দিলেন। শুরু হলো বারো বছর বয়সে জীবনযুদ্ধ। কত মানুষের কাছে কত লাথিঝাঁটা খেয়ে বড়ো হয়েছি। এসব পুরনো গল্প শুনতে ক'দিন তোমার ভালো লাগবে বলো তো?

অদিতি বলতো— তোমার একটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগে জানো। তুমি যখনই একটু সময় পাও বই পড়ো।

—হ্যাঁ। পড়াশোনার ওপর একটা ঝোঁক বরাবর ছিল আমার। তাই তো প্রাইভেটে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করলাম। তাই এখন এলআইসি-র এজেন্সি নিয়ে সংসারটা করতে পারছি। না হলে সেই হতদরিদ্র শ্রমিক জীবনই কাটাতে হতো। আয়ের সীমা থাকতো। কতো আর মাইনে হতো বলো? সাত কি

আট হাজার। এখন তো কোনো মাসে কুড়ি, কোনো মাসে পঁচিশ হয়। যতো বেশি নতুন পলিসি দিতে পারবো ততো বেশি কমিশন। অর্থাৎ দৌড়তে হবে। ছুটতে হবে। এই ছোটার নামই জীবন। জীবন একটা ঘোড়া বুঝলে?

রাস্তার গীতাঞ্জলি ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটার ঘণ্টা পড়ল। কী সুন্দর গীতাঞ্জলি ঘড়িটা। চল্লিশ ফুট উঁচু একটা টাওয়ার। তার গায়ে বাঁকুড়ার শিল্প। সেই টাওয়ারের মাঝখানটা ঘরের মতো। তার ভিতর গীতাঞ্জলি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। ওপরে একটা বাংলা হরফে বড়ো ঘড়ি। সেই ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি বাতাস তার ঘরে বয়ে নিয়ে আসে।

একটা সিগারেট ধরালেন সুমন পাল। সিগারেট খাওয়া বারণ। তবু খান। জীবন কতো বারণ শুনবে! জীবনের তো কিছু স্বাধীনতা চাই। এই বোধে তিনি সিগারেটে সুখ টান দেন। সুখ পান? কে জানে? তবে এটা ঠিক আগের মতো মৌতাত নেই তামাকে। তবু সিগারেট টানলে মনে হয় কিছু একটা কাজ করছেন। কিংবা তামাকের নেশার সঙ্গে সঙ্গে যত ভাবনা চলে আসে স্মৃতিতে। আগে কখনো দশটায় ঘুম থেকে উঠতেন না। পৈতৃক বস্তিবাড়িতে পাঁচ ভাইয়ের সংসার। একটা ছোটোখাটো মিছিল। তাই ভোরে উঠে জল তোলা। স্নান করা। অদিতি উঠতো। রান্নার জল তুলতো। স্নান করতো। একটু বেলা হয়ে গেলে কলের দখল চলে যাবে অন্য ভাইয়ের বউয়ের হাতে। ঝগড়া অশান্তি কার ভালো লাগে? ওই ভোরে জোর করে ঘুম থেকে তুলে মেয়েকে গরমে কী শীতে চান করতে পাঠাতো। মেয়েটা চাইতো না। বকাঝকা দিয়ে কলের কাছে পাঠাতো। ঠাণ্ডা লেগে যেত মেয়েটার। তাই তো লোন করে এই ফ্ল্যাট কেনা। তার কিস্তি দেবার জন্য ছুটতে হতো। দশটায় বেরিয়ে যেতেন এজেন্সির কাজে। দুপুরে দু'টো খেয়ে আবার ছুটতেন। নতুন পলিসি চাই। প্রতিদিন এনবি দিতে হবে। ডিও'র ফোন। ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের চাপ। এনবি আনো। বেশি এনবি দাও। মাসের শেষে মোটা কমিশন। সে তো এনবি-র দৌলতে। এনবি হলো নিউ বিজনেস। মানে নতুন পলিসি। তার জন্য ছোটা। দৌড়ানো। রেসের ঘোড়া। কিন্তু সূর্য ডুবে যাবার পর তিনি আর কাজ করতেন না। পৃথিবীতে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে তিনি ব্যাগের চেন টেনে কাজের পরিসমাপ্তি ঘটাতেন। তারপর কোনো দিন চলে যেতেন বাগবাজারে। সেখানে দাঁড়িয়ে গঙ্গা দর্শন করতেন। চা খেতেন। সিগারেট ধরাতেন। কোনোদিন চলে যেতেন আহিরিটোলা। সেখানে নিমতলা শ্মশানে দেখতেন জীবন কীভাবে ছাই হয়ে যায় জ্বলন্ত চিতায়। সোনার জীবন কয়েক ঘণ্টায় ছাই। দেখতেন কত মানুষ ঈশ্বরকে বুকে জড়িয়ে প্রার্থনা করছেন। পূজা দিচ্ছেন। রাতে ক্লায়েন্টদের সঙ্গে মিট করতেন না। কেউ যদি বলতেন— পলিসি করবেন? তিনি বলতেন— জীবন বিমা করবেন তো। এটা শুভ কাজ। রাতে নয়। সূর্যের আলোতে করবেন। অনেকে অবাক হতেন। কেউ বলতেন— দিনের বেলা আমার সময় হবে না। তিনি বলতেন— রবিবার করবেন।

—হ্যাঁ, রবিবার হবে।

এখন সেই ঘোড়া শান্ত। সব কাজ থেকে মুক্তি। ইচ্ছে করে বালুকা বেলায় পড়ে থাকা ঝিনুকের মতো বিছানায় শুয়ে থাকা। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। মেয়ের ফোন— হ্যাঁ মা বল।

তিয়াস বলে— তোমার শরীর কেমন আছে বাবা?

—ভালো। সিগারেটের ছাই ঝাড়ে সুমন পাল।

—অনেক দিন তোমায় ফোন করা হয়নি। শ্বশুরের ঘাটকাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

—ব্যস্ত থাকা তো ভালো।

—পূর্ণিমা পিসি কাজে আসছে বাবা?

—না। গ্রামে গেছে।

—কবে আসবে?

—বলেছে চার দিন পর। ক'দিন লাগায় কে জানে?

—তুমি এখন কী খাচ্ছো?

—সিদ্ধ ভাত। ভাজা মাছ। যেটুকু আমি পারি।

—আমার এখানে চলে এসো।

—না রে। ট্রেন অটো ঠেঙিয়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।

—বিধাননগর থেকে আগরপাড়া এটুকু পথ তোমার আসতে ইচ্ছে করে না?

সুমন পাল কোনো জবাব দেন না। সিগারেটের আগুন উসকে দেন।

—এই তুমি প্রতি বছর পূজায় কত দূর দূর জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গেছো আমাদের। এখন কাছেপিঠে কোথাও যাও না কেন বাবা?

—ইচ্ছে বলে তো একটা জিনিস আছে। তারও স্বাধীনতা আছে। সে না চাইলে আমি কী করে যাই?

—তোমার এই ফিলজফিক্যাল কথা আমি বুঝি না।

—ফিলজফির ছাত্রী হয়ে তুই বুঝিস না!

—আসলে মা চলে যাবার পর তুমি কেমন যেন হয়ে গেছো।

—কী রকম?

—আগে তোমার কাছে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরতো। এখন উলটো হয়ে গেছে।

—উলটো পথে চলছি আমি, তাই তো? সিগারেট নিভিয়ে দিলেন সুমন পাল।

—তুমিই ভাবো না। আগে বছরে দু'বার ট্যুরে নিয়ে যেতে। বৈশাখে কাছে পিঠে, পূজায় হিল্লি দিল্লি।

—দিল্লি তো তোদের নিয়ে গেছি।

—তাই তো বলছি। সেই মানুষটা ঘরকুনো হয়ে গেল কেন?

—বয়স বয়স। বয়স কী করে জানিস? মানুষকে সমুদ্রের বালির মধ্যে পড়ে থাকা শঙ্খ বা ঝিনুকের মতো ফেলে রাখে। নিশ্চল। স্থির। সমুদ্রের ঢেউ এসে কখনো একটু ঘুম ভাঙায়। একটু চলাচল করে। আবার আগের মতো পড়ে থাকে।

—তুমি বলতে চাইছো তোমার ভিতর একটা সমুদ্র আছে?

—আমার কেন? সবার ভিতর আছে। তোর ভিতরও আছে।

—কই আমি তো টের পাই না!

—পাবি পাবি। সময়কে আসতে দে। জানবি জীবনে যা আসে সময়ের পথ ধরে আসে। মানুষের জীবনের সব কিছু সময় নিয়ে আসে। দুঃখ-কষ্ট-সুখ-ঐশ্বর্য, এমনকী অহংকারও।

—শরীর খারাপ হলে ফোন করো। আমার তো চিন্তা হয়।

—চিন্তা করে তুই কী করবি? ভগবানের

ওপর কিছু তো করতে পারবি না।

—তা বলে চেষ্টা করবো না?

—রুটিন ওয়ার্ক। সময় হলে মৃত্যুর হাত ধরে চলে যেতে হবেই। যেমন তোর মা গেছেন।

—রাখছি বাবা।

মেয়েকে বললেন বটে চিরন্তন মৃত্যুর কথা কিন্তু অদিতির চলে যাওয়াটা কি তিনি এখনও মেনে নিতে পেরেছেন? জলজ্যান্ত প্রাণবন্ত মানুষটা! কোথাও কিছু নেই। পৃথিবী ঠিক পৃথিবীর মতো চলছে। অদিতি হঠাৎ বলল বুকে ব্যথা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের ওষুধ। ব্যথা কমল না। লোকাল ডাক্তার গৌরদা এলেন। দেখলেন। বললেন— হাসপাতাল মুভ করো সুমন এক্ষুনি। হাসপাতালও পৌঁছায়নি গাড়ি, মাঝপথে হাত তুলল অদিতি। হয়তো শিশুর মতো টা টা করল। হাসপাতালের ডাক্তার বললেন— অলরেডি এক্সপায়ার্ড। এই রকম অপ্রস্তুত মৃত্যু কেউ মেনে নিতে পারে? তার ভিতর একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে। তিনি বুঝতে শিখেছেন মানুষ কোনো শক্তি নয়। মানুষের ভিতর যিনি আছেন, তাঁর নির্দেশেই হচ্ছে জন্ম মৃত্যু। তাঁর ইচ্ছেতে জগৎ চলছে ছন্দে। তিনিই ভাঙছেন ছন্দ। যেন একজন সুরকার গীতিকার। অভিমানী সিগারেট তার মুখের আগুন নিভিয়ে দিয়েছে কখন। ফেলে দিলেন। গিজার অন করলেন। পূর্ণিমার কাজ তিনি করছেন এখন। বাসন মাজা। ঘর মোছা। ভাত বসানো ওভেনে। তাতে ফেলে দিলেন আলু, ডিম আর দুতিনটে সবজি।

বছরে দুবার গ্রামে যায় পূর্ণিমা। একবার ধান রুইতে আর একবার শীতে মেলা দেখতে। গ্রামের মানুষের মেলার ওপর ভীষণ টান। দিদা ঠাকুর হয়ে গেছে পূর্ণিমার তবু মেলার টানে গ্রামে ও যাবেই। গ্রামের মানুষ তুচ্ছ জিনিসে আনন্দ পায়। শহরের মানুষের কোনো কিছুতেই তৃপ্তি নেই। এবার পূর্ণিমা গ্রামে গেছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আবেদন করতে। এর আগে দুবার করেছে। হয়নি। গ্রামের মাতব্বররা বলছে— শহরে টাকা আয় করবে কাঁড়িকাঁড়ি আর গ্রামে তোদের ঘর দুবো কেনে? পূর্ণিমা নাকি বলেছে— শহরে না গেলে খাব কী? ঘর পরিষ্কার করার পর বারান্দার গাছগুলিতে দল দিলেন সুমন পাল। আগে কলের মুখে পাইপ লাগিয়ে গাছগুলিকে স্নান করাতেন। অদিতি বলতো— এতো জল দিলে গাছগুলো মরে যাবে যে।

—তুমি আমি স্নান করি না! মরে গেছি? ওরাও আমাদের মতো প্রাণী। ওদেরও স্নান আছে, আহার আছে। ঘুম আছে। ওরাও স্বপ্ন দেখে বুঝলে?

—গাছ স্বপ্ন দেখে! অদিতি অবাক হয়ে বলতো।

—অবশ্যই দেখে।

—তুমি কি করে বুঝলে?

—তুমি একবার গাছগুলোকে ভালো করে লক্ষ্য করো। গাছগুলো ডালপালা চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। কেন দেয়? এটা হলো নিজেকে বড়ো হবার স্বপ্ন দেখা। কিছু ডাল আকাশের দিকে উঠে যায়। মানে কী? আকাশকে ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখে। আর কীভাবে বোঝাবো তোমায়?

—তুমি কি কবিতা লিখতে?

—লিখতাম তো এক সময়।

—তাহলে ছেড়ে দিলে কেন?

—আমি ছাড়িনি। জীবন ছাড়িয়ে দিয়েছে।

—আবার শুরু করো না লেখা।

—দেখি। চেষ্টা করবো। এ তো সাধনার জিনিস। চাইলেই তুমি পারবে না।

গাছে জল দিতে দিতে আবার মনে পড়ে অদিতি বড়ো ভালোবাসতো ফুল গাছ। তিনি সল্টলেকের নার্সারি থেকে ফুলের চারা এনে দিতেন। অদিতি মাটি খুঁড়ে সার দিয়ে জল দিয়ে তাদের যত্ন করতো। গাছ যখন ফুলে ভরে যেত মুগ্ধ নয়নে দেখতো। তিনি বলেছেন— গাছে এতো ফুল! বাজার থেকে ফুল আনো কেন? অদিতি বলতো— ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গাছ থেকে ফুল তোলা পছন্দ করতেন না। গাছের ফুল তো গাছের সৌন্দর্য। রামকৃষ্ণ সারদা মার প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা। দু'বেলা পূজা। কথামৃত পাঠ। ভক্ত সম্মেলনে যাওয়া। জপ ধ্যান করা। মেয়ের বিয়ের পর আরও বেশি করে ঝুঁকে পড়লেন ধর্মের দিকে। তিনি বুঝতে পারতেন কন্যাহীন শূন্য ঘর অদিতিকে বড়ো ব্যথিত করতো। বলতো— তোমাকে আর একটা সন্তান নিতে বলেছিলাম। নিলে না। যদি নিতে এভাবে শূন্যতা গ্রাস করতো না। তিনি বলতেন— বস্তির ওই ছোট্ট ঘর। নানা সমস্যা। আয়ের নিশ্চয়তা ছিল না। কী করে আর একটা সন্তান আনি? ঠাকুর তো বলেছেন একটা ছেলের পর স্বামী স্ত্রী ভাই-বোনের মতো থাকবে।

কলিং বেলটা বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখলেন পোস্টম্যান। রেজিস্ট্রি ডাকে এসেছে উদ্বোধন পত্রিকা। অদিতি ছিল লাইফ মেম্বার। প্রতিটি সংখ্যা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তো। না, এবার পত্রিকা অফিসে গিয়ে জানিয়ে দিতে হবে অদিতি আর পৃথিবীতে নেই। এই কথাটা জানাবে জানাবে করে আজ দু'বছর হয়ে গেছে তিনি জানাতে পারেননি। কেন? সবাই তো জানে অদিতি নেই। অন্তত একটা জায়গা জানুক অদিতি নামের গ্রাহক এখনও বেঁচে আছে।

চায়ের জল চাপিয়ে হাত মুখ ধুলেন সুমন পাল। দাঁড়ালেন আয়নার সামনে। বাসি দাড়িতে হাত বোলালেন। দাড়ি একদম পছন্দ করত না অদিতি। তিনি বলতেন— ঠাকুরের তো দাড়ি ছিল।

—ঠাকুরের চামড়া ছিল খুব পাতলা। তিনি অবতারবরিষ্ঠ। তাঁর কথা ছেড়ে দাও।

অদিতি নেই। দাড়ি কাটার ইচ্ছে চলে গেছে। গ্রিন টি নিয়ে বারান্দার ইজি চেয়ারে বসলেন সুমন পাল। টেনে নিলেন খবরের কাগজটা। নেড়েচেড়ে দেখলেন। রেখে দিলেন। এক সময় খুঁটিয়ে পড়তেন। অদিতি বলতো— কাগজে এতো কী লেখে গো?

—কেন একথা বলছো?

—না। তুমি দেখি পরীক্ষার্থীদের মতো খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ো।

—তুমি কী বলতে চাইছো?

—আমার পাশে একটু বসো না। দুটো গল্প করি। এতক্ষণ কাগজ না পড়ে আবার কবিতা লেখ না! বিয়ের আগে যেমন লিখতে।

এখন আর ভালো লাগে না কবিতা। কেন এমন হয়? কবিতা তো জীবনের কথা বলে। আর জীবন যতদিন আছে, কবিতা তো ভালো লাগার কথা। তবে নিঃসঙ্গতা জীবনের সব রস শুষে নেয়। আখ মাড়াইয়ের কলের মতো।

সব রস নিংড়ে নিয়ে করে দেয় ছিবড়ে। এখন তার জীবনটা ছিবড়ে। তাহলে রসটা কে? অদিতি?

বুকের ভিতর কে যেন বলল— হ্যাঁ, হ্যাঁ। এতোদিন পর বুঝলে!

আবার বিছানায় এলেন। সামনের দেওয়ালে অদিতির একটা ছবি। হাসছে। মুক্তোর মতো দাঁত। রৌদ্রের কিরণের মতো হাসি। হাসতে পারতো বটে অদিতি। বাপের বাড়ি ছিল অভাবের সংসার। ওরা সাত ভাই-বোন। সকলে খুব হাসতে পারতো। ওদের কাছে হাসিটা ছিল সুলভ। সুমন পালের মনে হয়েছে অভাবের কুৎসিত রূপটা আড়াল করতে ওরা শিউলি ফুলের মতো হাসতো। মানুষ যাতে বুঝতে না পারে ওরা অভাবী সংসারের মানুষ। বিশ্ব তো অভাবকে নীচু চোখে দেখে। অভাবী মানুষকে নীচু চোখে দেখে। অভাবী মানুষকে অবজ্ঞা করে, ঘৃণা করে। জীবনের এই ট্র্যাজেডি লুকাতে সর্বদা মুখে রোদ ঝলমলে হাসি। দূর থেকে ভজন গান ভেসে আসছে। পিছনে দাস পাড়া। ডাল কল অনেক। মাড়োয়ারি বসতি। মাঝে মাঝে সেখান থেকে ভজন সংগীত ভেসে আসে। ভালো লাগে সুমন পালের। তিনি চুপচাপ শোনেন। সেই ভজনের ভিতর তিনি জীবনের পাওয়া-না-পাওয়ার সুর অনুভব করেন।

অদিতি একদম হাঁটতে পারতো না। সব সময় পিছনে পড়ে থাকতো। আবার অভিযোগ করতো— আমাকে ফেলে তুমি আগে আগে যাও কেন?

তিনি হাসতেন।

অদিতি বলতো— আমি কি তোমার মতো বড়ো বড়ো পা ফেলে হাঁটতে পারি? তবে কথা দিচ্ছি একদিন তোমাকে পিছনে ফেলে আগে চলে যাবো দেখবে।

—কোনোদিন পারবে না তুমি। সুমন পাল গলায় জোর দিয়ে বলতেন। আর হাসতেন।

কিন্তু অদিতি কথা রাখলো। তাকে ফেলে আগে চলে গেল। শুধু গেল না। তাকে শূন্য করে, রিক্ত করে, নিঃস্ব করে চলে গেল।

সামনে মিলের মাঠ থেকে ভেসে আসছে একটা কোকিলের ডাক। কোকিল ডাকে কোকিলাকে। যৌবন বয়সে একজন জিজ্ঞেস করেছিল তাকে, তুমি জানো কোকিল কেন ডাকে? সেদিনও পার্কে একটা কোকিল সামান্য বিরতি দিয়ে ডেকে যাচ্ছিল সুমধুর কণ্ঠে। তিনি বলেছিলেন— না, আমি জানি না কেন কোকিল ডাকে।

লোকটা মৃদু হেসে বলেছিল, কোকিলাকে ডাকছে। সঙ্গিনীকে ডাকছে।

শুধু মানুষ নয়। কোনো পাখিও একা থাকতে পারে না। হঠাৎ অদিতির একটা কথা মনে পড়ল। অদিতি বলতো, যদি আগে চলে যাই, একা লাগে তোমার, তবে আর একটা বিয়ে কোরো। আমি রাগ করবো না।

—বিয়ে! তখন যদি যাট পার করে ফেলি সঙ্গিনী পাবো?

—পাবে। ঠিক পাবে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে। ওই বয়সে অনেক পুরুষ বিয়ে করেন। রবিশঙ্কর তো সত্তর বছর বয়সে বিয়ে করলেন আবার।

সুমন পাল গলা ছেড়ে হেসেছিল।

—হাসছো যে!

—কোথায় রবিশঙ্কর কোথায় সুমন পাল!

—একটা জিনিস ভেবে দেখ, তোমাদের দু'জনের কাজই জীবন নিয়ে। একজন সেতারে সুরের ঝংকার তুলে জীবনকে আনন্দ দেন আর তুমি সেই জীবনকে নিরাপত্তা দাও জীবন বিমা বেচে।

—দারুণ কথা বললে তো তুমি! সেদিন সুমন পাল শুধু মুগ্ধ হননি, স্ত্রীর ওপর গভীর শ্রদ্ধা নেমে এসেছিল হৃদয়ে।

—আরও একটা জিনিস আছে, অদিতি মৃদু হেসে বলেছিল।

—কী? সুমন পালের গলায় ছিল অধীর আগ্রহ। প্রবল উৎসাহ। এই অদিতি কে? বিস্মিত চোখে তাকিয়ে ছিলেন স্ত্রীর দিকে।

হাসতে হাসতে অদিতি বলেছিল— রবিশঙ্কর পুরুষ, তুমিও পুরুষ। এসব কথা ছাড়ো। আসল কথা কি জানো? পুরুষমানুষ স্ত্রী ছাড়া জীবন কাটাতে পারে না। যেমন ঘরবাড়ির খুঁটি থাকে, স্ত্রী হচ্ছে পুরুষের জীবনে শক্ত খুঁটি, বুঝলে সুমন পাল?

সেদিন কথাটা শুনে থম দিয়ে তিনি বসেছিলেন অনেকক্ষণ। এতো চরম সত্য। কে অস্বীকার করবে? কেউ অস্বীকার করলে, করবে সামনে, আড়ালে মেনে নেবে এই অমোঘ সত্যকে।

মিলের মাঠের কোনো গাছের আড়াল থেকে এখনো কোকিলটা ডেকে যাচ্ছে। ও বুঝি খুঁটি খুঁজছে।

□

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব বঙ্গভূমির পরমতম আশীর্বাদ

গোপাল চক্রবর্তী

বঙ্গ তথা ভারতের ইতিহাসে সে এক ভয়াবহ সময়। দিল্লিতে ইসলামি শাসন। বখতিয়ার খলজি নামে এক মুসলমান সেনাপতি অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে অতর্কিতে রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ ও দখল করে। বঙ্গের সৌভাগ্য সূর্য তখনই অস্তমিত হয়। কালক্রমে রাজা সুবুদ্ধি রায়ের অনুগৃহীত কর্মচারী পাঠান হুসেন খাঁ, শাহ উপাধি ধারণ করে বঙ্গের সিংহাসনে বসেন। তাঁর অধীনে এক এক স্থানে এক একজন কাজিকে রাখলেন। এই সব কাজিরা সৈন্য সামন্তে পরিবেষ্টিত থাকতেন। রাজ্য শাসন তাঁদের করতে হতো না। তাঁদের অধীনে হিন্দু রাজারা শাসন করতেন। এই কাজিরা হিন্দুরাজাদের কাছ থেকে কর আদায় করে কিছু নিজেরা রাখতেন, কিছু গৌড়ে পাঠাতেন। আর যদি তাঁদের কাছে কোনো অভিযোগ আসত তার বিচারও করতেন। নবদ্বীপে চাঁদ খাঁ নামে এক কাজি ছিলেন।

মুসলমান আক্রমণে হিন্দুদের তীর্থযাত্রাও বিপদসংকুল ছিল। গৌড় দেশ থেকে যাঁরা তীর্থে গমন করতেন তাঁরা প্রায় দক্ষিণ দেশেই যেতেন। কারণ তখন পশ্চিমে হিন্দু মুসলমানে প্রায় সংঘর্ষ চলতো; কাজেই যাতায়াতের পথ বন্ধ ছিল। এমনকী শ্রীবৃন্দাবনও তখন মুসলমানদের উৎপাতে জঙ্গলময় হয়েছিল। তখন প্রায় কেউ-ই শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে যেতেন না। এই সময়ে যাঁরা তীর্থে যেতেন তাঁরা শ্রীক্ষেত্র হয়ে, বিষ্ণুকাঞ্চী, শিবকাঞ্চী প্রভৃতি দর্শন করে কন্যাকুমারী যেতেন। পরে সেখান থেকে নাসিক, পাণ্ডুপুর, সৌরাষ্ট্র, দ্বারকা দর্শন করে প্রত্যাবর্তন করতেন।

এই সময়ে সমাজের কর্তা ছিলেন অধ্যাপকরা। তাঁরা বহু পরিশ্রমে বিদ্যা ও জ্ঞানার্জন করে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই তাঁদের ধর্মের উ পর আস্থা কমে যেত। সেই সময়ে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চার জন্য নবদ্বীপ সমগ্র ভারতে বিখ্যাত ছিল। এই ন্যায়শাস্ত্র আগে নবদ্বীপে ছিল না, এর চর্চা মিথিলায় হতো, আর ন্যায় পড়তে হলে নবদ্বীপ ও অন্যান্য স্থানের পড়ুয়াদের মিথিলা যেতে হতো। মিথিলাবাসী পণ্ডিতরা গৌড়ীয় পড়ুয়াদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখে সশঙ্কিত ছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের আধিপত্য বিনষ্ট হবে। তাই আধিপত্য রক্ষার্থে তাঁরা গৌড়ীয় কোনো ছাত্রকে ন্যায়ের কোনো পুস্তক সঙ্গে আনতে দিতেন না। কাজেই পুস্তক অভাবে নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল হতে পারত না রামভদ্র ভট্টাচার্য সর্বপ্রথম নবদ্বীপে একটি ন্যায়ের টোল স্থাপন করলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত

মহেশ্বর বিশারদের দুই পুত্র বাসুদেব ও বাচস্পতি রামভদ্রের টোলে ন্যায় অভ্যাস করে। রামভদ্র ন্যায়শাস্ত্র পড়ান বটে কিন্তু গ্রন্থের অভাবে পদে পদে পদস্খলন হয়। এই কারণে, আবার পড়তে গিয়ে অনেক কষ্ট পেয়ে বাসুদেব মনে মনে একটি কঠিন সংকল্প করলেন যেভাবেই হোক তিনি মিথিলা থেকে ন্যায়ের গ্রন্থ নবদ্বীপে আনবেন। এই মনস্থ করে, আর পাঠ সমাপ্তির জন্য বাসুদেব মিথিলায় গমন করলেন। কিছুদিনের মধ্যে ন্যায়ের বৃহৎ গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করে বাসুদেব নবদ্বীপে ফিরে এলেন। এই অমানুষিক ঘটনার জন্য বঙ্গদেশ চিরদিন বাসুদেবের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। বাসুদেব কর্তৃক সেই গ্রন্থ লিখিত হলো, একই সঙ্গে মিথিলার আধিপত্য লুপ্ত হয়ে নবদ্বীপে এল। বাসুদেব সার্বভৌমের খ্যাতি সমস্ত ভারতে প্রচারিত হলো। পড়ুয়ারা দলে দলে তাঁর টোলে এসে নবদ্বীপ পরিপূর্ণ করতে লাগল।

নবদ্বীপের তখন যে অবস্থা হলো, তা কখনো কোথাও দেখা যায়নি। কোনো নগর কখনো যুদ্ধের নিমিত্ত উন্মত্ত হয়, কখনো নাগরিকরা ধন উপার্জনের নতুন কোনো পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় উন্মত্ত হয়, আবার কখনো নতুন কোনো ধর্মমত নিয়ে বা রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে উন্মত্ত হয়, কিন্তু নবদ্বীপ নগর বিদ্যা নিয়ে উন্মত্ত হলো। ভদ্রলোকরা অন্যান্য চিন্তা একেবারে ছেড়ে দিল। সকলেরই মনের ভাব যে বিদ্যা উপার্জনই মানুষের প্রধান সাধন। যে পণ্ডিত তাঁরই জীবন সার্থক।

জগন্নাথ মিশ্র নামে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ এই বাসুদেব সার্বভৌমের সহপাঠী ছিলেন। তাঁর পিতা উপেন্দ্র মিশ্রের নিবাস ছিল শ্রীহট্টের মধ্যে ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে। উপেন্দ্র মিশ্রের সাতপুত্র, জগন্নাথ তৃতীয়। এই জগন্নাথ নবদ্বীপে অধ্যয়ন করতে আসেন এবং পরম পাণ্ডিত্য লাভ করেন। দেখতেও পরম সুন্দর, নবদ্বীপে তিনি অদ্বিতীয় রূপবান ব্যক্তি বলে বিখ্যাত ছিলেন। জাত্যাংশেও কুলীন, ভরদ্বাজ বংশজাত। সার্বভৌমের পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী ও গুরু রামভদ্র সমসাময়িক ছিলেন। নীলাম্বরের দুই পুত্র, দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম শচী। রূপ গুণ দেখে লীলাম্বর চক্রবর্তী কন্যা শচীর সঙ্গে জগন্নাথ মিশ্রের বিবাহ দিলেন। জগন্নাথ আর শ্রীহট্টে ফিরে গেলেন না। যদিও দরিদ্র, তথাপি তাঁদের সংসার যাত্রা অনায়াসেই নির্বাহ হতো। শচীদেবী পরপর আটটি কন্যার জন্ম দেন এবং তারা অল্প বয়সেই মারা যায়। তারপর এক পুত্রের জন্ম হয়। পুত্রের নামকরণ হয় বিশ্বরূপ। বালক বিশ্বরূপ রূপে গুণে অতুলনীয়। বিশ্বরূপের বয়স যখন দশ বছর তখন শচীদেবী আবার গর্ভধারণ করেন। শচীর গর্ভ দশম মাস উত্তীর্ণ হলো তবুও সন্তানের জন্ম হলো না। ক্রমে একাদশ মাসও উত্তীর্ণ। মাঘ মাসে গর্ভধারণ করেছিলেন আবার মাঘ মাস এল তবুও প্রসব হলো না। পরে ফাল্গুন মাস এল, তখন জগন্নাথ ব্যস্ত হয়ে শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্তীকে ডাকলেন। নীলাম্বর চক্রবর্তী বিখ্যাত জ্যোতিষী তিনি গণনা করে দেখলেন। সত্বর শচী প্রসব করবেন এবং এক মহাপুরুষের জন্ম দেবেন। ক্রমে সেই শুভক্ষণ সমাগত হলো—

চৌদ্দ শত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ।।
সিংহরাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড় বর্গ অষ্ট বর্গ সর্ব শুভক্ষণ।।

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

১৪০৭ শকে পবিত্র জাহ্নবীতীরস্থ বিদ্বজ্জন পরিশোভিত নবদ্বীপ নগরে মনোহর ফাল্গুন মাসে নির্মল পূর্ণিমা নিশিথে শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হলেন। জগন্নাথ মিশ্রের বাড়িতে একটি বড়ো নিমগাছ ছিল তার তলাতে আঁতুড়ঘরে শ্রীগৌরাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হলেন। ধাত্রী দেখলেন শিশুটির মধ্যে জীবনের চিহ্নমাত্র নেই। তখন তাঁকে জীবিত করার জন্য সকলে চেষ্টা করতে লাগলেন। একটু পরে শিশুটি কান্না করে উঠল তখন সকলে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। নবজাতকের দেহ স্বাভাবিকের থেকে কিছু বড়ো, কারণ তিনি ত্রয়োদশ মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন। গাত্রবর্ণ একেবারে কাঁচা সোনার মতো। পিতা জগন্নাথ পুত্রের নাম রাখলেন বিশ্বম্ভর। জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ ও বয়স্যরা তাঁকে বিশ্বম্ভর নামে ডাকত। কিন্তু জননী তাকে নিমাই বলে ডাকতেন। আর পরিশেষে সেই নামে তিনি সকলের কাছে বিখ্যাত হন। তাঁর সুতিকাগৃহ নিমগাছের তলায় ছিল বলে এই নামের সৃষ্টি। উপনয়নের সময় নাম হয় গৌরহরি। ভক্তরা তাঁকে শ্রীগৌরাঙ্গ বা গৌর নামে ডাকতেন। পরবর্তীকালে তাঁর নাম হলো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শৈশব থেকে নিমাইয়ের আকৃতি প্রকৃতি অন্য শিশুদের মতো নয়। প্রথমত, যেরূপ বয়স সেই অনুপাতে তার শরীর অনেক বড়ো, সেই শরীরে রোগমাত্র নেই। এই শিশু এরূপ বলবান ও চঞ্চল যে প্রতিবেশীরা তাকে কোলে তুলে রাখতে পারবেন না। শিশুর আর একটি প্রকৃতি দেখে সবাই বিস্ময়াপন্ন হলেন, শিশু যখন কোনো কারণে কান্না করে, তখন হরিনাম শোনালে চুপ করে। শিশু নিমাই যখন হামাগুড়ি দিয়ে চলত তা এক অপূর্ব শোভা। এই শোভা দর্শন করার জন্য শচীমাতা তাকে আঙিনায় ছেড়ে দিতেন, এবং সকলের সঙ্গে তা উপভোগ করতেন। পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ নিমাইয়ের হামাগুড়ি প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন—

'এমুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচীবালা।।
লালে মুখ ঝরঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্ব ফলজিনি সুন্দর অধর।।'

নিমাই যখন হাঁটতে শিখল তখন পরিবারের সকলেই তটস্থ, কখনো কোনো ফাঁকে কোথায় পালিয়ে যাবে। একদিন নিমাই একটি সাপ ধরাতে সকলের ভয় আরও বেড়ে গেল। একদিন মেঘমালী নামে এক নির্দয় তস্কর নিমাইকে একা এবং স্বর্ণালংকারে ভূষিত দেখে লোভের বশে অপহরণ করে। এদিকে নিমাইকে না দেখতে পেয়ে বাড়িতে ও পল্লীতে হাহাকার পড়ে যায়। সবাই চারদিকে খোঁজ করছে কিন্তু কোথায় নিমাই? মেঘমালী নিমাইকে নিয়ে চলেছে কোনো নির্জন স্থানে তাকে হত্যা করে অলংকারগুলি খুলে নেবে। যেতে যেতে তস্কর আবার তাকালো নিমাইয়ের মুখের দিকে, দর্শন মাত্র তার হৃদয় স্নেহে আপ্লুত হলো। এই শিশুকে বধ করবে! এই কথা মনে করে হৃদয় শিহরিত হলো, নিজের নৃশংস প্রবৃত্তির জন্য নিজে লজ্জিত হলো। নিমাইকে এনে বাড়ির কাছে ছেড়ে দিয়ে সে নিজের পথে চলে গেল। ক্রমে সে ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হলো এবং কালে সে সংসার ত্যাগ করে সাধু হলো।

এদিকে ছাড়া পেয়ে নিমাই ছুটে গিয়ে পিতার কোলে উঠল। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। এই শিশুটির আকৃতি মানুষের মতো হলেও ঠিক অন্যান্য শিশুর মতো ছিল না। তারা কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ, যা

ইতিপূর্বে শুধু কবির কল্পনার বিষয় ছিল তা মনুষ্য বালক নিমাইয়ের দেহে প্রত্যক্ষ করলো। আর হস্ততল ও পদতল যেন হিঙ্গুল দিয়ে রঞ্জিত। হাঁটার সময় মনে হতো যেন পদতল দিয়ে রক্ত ঝরছে। অঙ্গের গঠন সুঠাম। প্রতি অঙ্গের চলন, গতি, নয়নের দৃষ্টি, মুখের হাসি এবং কথা সবই লাবণ্যময়। ঠোঁট দুখানি পক্ক বিম্বফলের মতো। তবে নয়ন দুটি সর্বাপেক্ষা মনোহর। দেবতা ভিন্ন মানুষের এরূপ চোখ হতে পারে তা এই শিশুকে দেখার আগে কেউ বিশ্বাস করতে পারতেন না। শিশুটি যখন যার দিকে দৃষ্টিপাত করতো তার চিত্ত সেই ভাবটি এই যে একটি মানব শিশু না দেবশিশু? নিমাইয়ের আর একটি অপ্রাকৃতিক গুণ ছিল, তাকে কোলে নিলেই কী পুরুষ নারী সকলের শরীর আনন্দে পুলকিত হতো। তাই কেউ তাকে কোলে নিলে সহজে ছাড়তে চাইতেন না।

নিমাইয়ের জন্মের পর শচীদেবী, জগন্নাথ মিশ্র এবং অন্যান্য আত্মীয় পরিজনেরা বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা দেখতে লাগলেন। যেমন কেউ হয়তো দেখছে নিদ্রিত নিমাইয়ের বুকে চন্দ্রের মতো কিছু জ্বলছে। কখনোও দেখা গেল তার সর্বাঙ্গ বিদ্যুৎ দ্বারা আবৃত। আবার কখনোও শচীদেবী গৃহমধ্যে অনেক জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখতে পেতেন, ভয় পেয়ে তিনি জগন্নাথ মিশ্রকে ডাকতেন। কখনোও ভাবতেন এরা চোর, আবার কখনোও মনে হতো এরা ডাকিনী, তখন তিনি আতঙ্কিত হয়ে প্রচলিত লোকাচারের দ্বারা পুত্রের অমঙ্গল বিতাড়নের চেষ্টা করতেন। একরাতে শচীদেবীর কোলে নিমাই নিদ্রিত। শচীদেবী দেখলেন নানান জ্যোর্তিময় মূর্তি পুত্রকে ঘিরে আছে। এইরূপ অলৌকিক ব্যাপার দেখতে দেখতে শচীদেবীর তখন একটু সাহস হয়েছে। তিনি নিমাইকে জাগিয়ে নিরাপত্তার জন্য পিতার ঘরে পাঠাচ্ছেন, জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে যেতে আঙ্গিনা পেরিয়ে যেতে হয়। জগন্নাথ মিশ্রও তখন বাইরে বেরিয়েছেন নিমাই আঙ্গিনা পেরোনোর সময় পিতা-মাতা উভয়ে শুনলেন নিমায়ের শূন্য পদযুগল থেকে অপূর্ব নূপুরধ্বনি শোনা যাচ্ছে। পরে নিমাই নিদ্রিত হলে জগন্নাথ মিশ্র স্ত্রীকে বললেন—

—আমাদের পুত্রের দেহে গোপাল বিরাজ করেন।

বাৎসল্য স্নেহে অভিভূত শচীদেবী এতে আপনাকে কিছুমাত্র গৌরবান্বিত মনে না করে বললেন—

—যিনিই থাকুন, আমার পুত্রের যেন কোনো অমঙ্গল না হয়।

পাঁচ বছর বয়সে নিমাইয়ের হাতে খড়ি দিলেন পিতা জগন্নাথ মিশ্র। কিন্তু নিমাইয়ের পড়াশোনার একটুও মন নেই, সারাদিন খেলাতেই তার আনন্দ। সন্ধ্যে হলে নিমাই ঘুমানোর আগে শচীদেবী কিছু সময় আনন্দ সাগরে ভাসতেন। এই সময়ে নিমাইকে নিয়ে তিনি খেলা করতেন এবং নিমাই মায়ের সঙ্গে খেলা করত।

ওই সময়ের পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ মায়ের সঙ্গে নিমাইয়ের খেলার এরূপে বর্ণনা করেছেন—

শচীর আঙিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়।।
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু।।
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে।।
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি এই জগ-মন লোভা।।

আবার চৈতন্য মঙ্গলে :

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে খটী করে।
ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে।।
শচীমার স্তনযুগে দু'পা রাখিয়ে।
সোনার লতিকা দোলে যেন বায়ু পেয়ে।।

শচীদেবীর বড়ো শুচিবাই, এই জন্য নিমাই সর্বদা মাতাকে বিব্রত করার চেষ্টা করত। যা অশুচিও স্পর্শ করা নিষেধ, নিমাই জননীকে দেখিয়ে দেখিয়ে তাই স্পর্শ করত, আর শচীদেবী হাহাকার করতেন। নিমাইকে তিরস্কার করে বলতেন—

—তুই ব্রাহ্মণের ছেলে, তোর আচার জ্ঞান হলো না।

একদিন নিমাই ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির উপর হাঁড়ি রেখে তার উপর দাঁড়াল। শচীদেবী এই কাণ্ড দেখে পুত্রকে ধিক্কার দিয়ে বলছেন—

—তুই একেবারে মজালি তোকে ব্রাহ্মণ সন্তান কে বলবে?

প্রত্যুত্তরে নিমাই কী বলেছেন তা নিমাইয়ের সমসাময়িক মুরারিগুপ্ত তাঁর 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' গ্রন্থে সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন—

'শৃনু শুচিরশুচির্বা কল্পনামাত্রমেতৎ,
ক্ষিতিজলপবনাগ্নিব্যোমচিত্তং জগদ্ধি।
বিততবিভবপূর্ণাদ্বৈতপাদব্জ একো,
হরিরিহ করুণার্বিভাতি ন্যান্যৎ প্রতীহি।।
(ষষ্ঠ সর্গ—১৬)

অর্থ : হে মাতঃ! শ্রবণ করুণ। ক্ষিতি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, চিত্ত, জগৎ শূচি বা অশুচি এই সকলই কল্পনা মাত্র। একমাত্র সেই পরিপূর্ণতম অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীহরির পাদপদ্মের অনন্ত ঐশ্বর্যই সেই ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া জানিবে। তিনি ভিন্ন আর অন্য কিছুই নাই।'

এরূপ ভাবের কথা শুনে শচী বিস্মিত হলেন, তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না একথা নিমাই বলছে। তখন আর নিমাইকে পাঁচ বছরের শিশু বলে মনে হলো না। যেন এক পরম জ্ঞানীপুরুষ তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। সেই সময়ে শচীদেবীর মনে হলো তিনি একজন অবোধ রমণী আর নিমাই তাঁর পরম উপদেষ্টা। কিন্তু সেই ভাব বেশিক্ষণ থাকল না, পুনরায় নিমাইয়ের বাল্য চাপল্য দেখে সব ভুলে গেলেন।

জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ। রূপ ও গুণে বিশ্বরূপের তুলনা ছিল না। তার বুদ্ধি এত সতেজ যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত শাস্ত্র অভ্যাস করেছিলেন। ছোটো ভাইকে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। কিন্তু দিবানিশি শাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকায় তার প্রতি তত দৃষ্টি দিতে পারতেন না। তাই নিমাইয়ের চাঞ্চল্য আরও বেড়ে গিয়েছিলেন। পিতা জগন্নাথ মিশ্রকে আজীবন দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি প্রায় বাইরে থাকতেন। বিশ্বরূপ টোলে থাকুক বা ঘরে থাকুক সর্বদা গ্রন্থের মধ্যে আবিষ্ট থাকতেন। কাজেই নিমাই পিতা কিংবা অগ্রজের সাহচর্য তেমন পেত না। কিন্তু অগ্রজের নিকট নিমাই বড়ো নম্র থাকত। নিমাই পিতা অপেক্ষা অগ্রজকে বেশি সম্মান করতেন। ইতিমধ্যে অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে বিশ্বরূপের মিলন হলো। বিশ্বরূপকে দেখে শ্রীঅদ্বৈত ও তাঁর পার্ষদরা বড়ো মুগ্ধ হলেন। বিশ্বরূপও অদ্বৈতের সভায় বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতত্ত্ব শুনে বড়ো আনন্দ পেলেন।

ক্রমে তাঁর অন্তরে বৈরাগ্য প্রকট হলো। ইতিমধ্যে পিতাকর্তৃক বিবাহ প্রস্তাবে বিশ্বরূপ বিষাদসাগরে নিমগ্ন হলেন। বিশ্বরূপ ভাবলেন তাঁর গৃহত্যাগ করাই শ্রেয়। সন্ন্যাসী হলে সে কুল উদ্ধার হয়ে যায়। আবার ভাবলেন গৃহত্যাগ করলে নিমাইয়ের কী হবে? কে তাকে বিদ্যাশিক্ষা দেবে, কে তার তত্ত্বাবধান করবে? কিন্তু গৃহত্যাগ তাকে করতেই হবে, নতুবা সংসারে আবদ্ধ হতে হবে। শেষপর্যন্ত নিমাইয়ের জন্য মায়ের কাছে একখানি গ্রন্থ গচ্ছিত রেখে একরাত্রিতে সকলের অগোচরে সাঁতারে গঙ্গা পেরিয়ে অজানার উদ্দেশে পা বাড়ালেন। এই কথা জানাজানি হতে সংসারে শোকের ছায়া নেমে এল। চপল প্রকৃতির বালক নিমাই সংসারের এই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারল। সমস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করে নিমাই পাঠে মনোযোগ দিল। তিলার্ধও মাতা-পিতার থেকে দূরে থাকত না। পাছে চোখের আড়াল হলে মাতা-পিতার মনে বিশ্বরূপের শোক পুনরুদ্দীপিত হয় এই ভেবে গৃহে বসে পিতার নিকট পাঠাভ্যাস করত। নিমাইয়ের মধুর চরিত্রে শচী ও জগন্নাথ অনেক সান্ত্বনা পেলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।

একদিন ঠাকুরের নৈবেদ্য থেকে নিমাই তাম্বুল নিয়ে খেল, আর সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। নিমাইয়ের অজ্ঞান অবস্থা বার বার দেখে মাতা-পিতা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা এ নিয়ে আর ভয় পেতেন না। তাঁরা নিমাইকে চেতন করার জন্য নানা চেষ্টা করতে লাগলেন। অল্পক্ষণ পরে চেতনা ফিরে পেয়ে নিমাই একটি অদ্ভুত ঘটনা শোনাল। বিশ্বরূপ এসে নিমাইকে এক অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে গেল এবং তাকে সন্ন্যাসী হতে বলল।

নিমাই বলল— আমার বয়স এখন অল্প, আমি এখন সন্ন্যাসের কী জানি। আমি গৃহে থেকে মাতা-পিতার সেবা করব। তাহলে লক্ষ্মী- জনার্দন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। একথা শুনে দাদা বললেন—

—ভালো, তবে তুমি যাও, গিয়ে পিতা-মাতাকে আমার কোটি প্রণাম জানিও।

এই ঘটনা শুনে শচী-জগন্নাথের হর্ষে বিষাদ হলো। এরূপে দৈবযোগে পুত্রের সংবাদ পেয়ে, আর বিশ্বরূপ যে তাঁদের বিস্মৃত হয়নি তা শুনে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং সেই সঙ্গে ভীতও হলেন এই ভেবে যে— বিশ্বরূপ কি নিমাইকেও ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে চায়।

শচী এই ভয়ের কথা অল্প দিনের মধ্যে ভুলে গেলেন কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র ভুললেন না। বিশ্বরূপ বেশি অধ্যয়নের ফলে জগতের অনিত্যতা সম্পর্কে জেনে সংসার ত্যাগ করেছেন বেশি অধ্যয়নের নিমাই যে অগ্রজের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না তার নিশ্চয়তা কী? এসব ভেবে তিনি নিমাইয়ের অধ্যয়ন কঠোরভাবে বন্ধ করলেন। নিমাই ছাড়া পেয়ে দিবমান বয়স্যদের সঙ্গে খেলায় মেতে রইল। গঙ্গার তীরে পূজারিণীরা মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিতে যান, নিমাই তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলে— আমায় পূজা কর, তোমাদের অভীষ্ট পূরণ হবে।

পূজারিণীদের কেউ বিরক্ত হয়, কেউ ক্রুদ্ধ হয়। আবার কেউ তাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে হৃষ্টমনে ঘরে ফিরে যায়। একদিন নিমাই নোংরা ফেলার জায়গায় অনেকগুলি এঁটো হাঁড়ি দিয়ে এক আসন বানিয়ে তার উপর বসে পড়ল। শচীদেবী এই দৃশ্য দেখে রেগে আগুন। নিমাই বলল তাকে যদি আবার পড়ার অনুমতি না দেওয়া হয় তবে সে এই আসন ত্যাগ করবে না। অগত্যা শচীমাতা অঙ্গীকার করলেন নিমাইয়ের পিতাকে বলবেন তাঁর আদেশ ফিরিয়ে নিয়ে নিমাইকে আবার অধ্যয়নের অনুমতি দিতে। তখন নিমাই আস্তাকুড় থেকে বেরিয়ে গঙ্গায় স্নান করে পবিত্র হয়ে বাড়িতে প্রবেশ করল।

নিমাই নবমবর্ষে পদার্পণ করলে জগন্নাথ মিশ্র তার উপনয়নের ব্যবস্থা করলেন। ক্ষৌরকর্মের পর যখন জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের কানে মন্ত্র দিলেন তখন নিমাই প্রথমে হুংকার ও গর্জন করল, পরে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। সবাই দেখল তার সমস্ত অঙ্গ পুলকিত হয়েছে, অঙ্গ থেকে এক অপার্থিব জ্যোতি নির্গত হচ্ছে। অশ্রুধারায় ধরণী সিক্ত হচ্ছে।

নিমাইয়ের বয়স যখন একাদশ তখন বার্ধক্য জনিত কারণে পিতা জগন্নাথ মিশ্র পরলোকগমন করেন। যথাবিধি শ্রাদ্ধশান্তির পর নিমাই আবার অধ্যয়নে মনোনিবেশ করল। ন্যায়শাস্ত্র আত্মস্থ করার পর নিমাই নবদ্বীপে নিজে টোল খুললেন। অল্প দিনের মধ্যে বিদ্বান, পণ্ডিত হিসেবে তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নিমাই ন্যায়শাস্ত্রের এক অমূল্য টীকা রচনা করেছিলেন কিন্তু সতীর্থ রঘুনাথের উপর করুণাবশত সেই গ্রন্থ তিনি গঙ্গায় বিসর্জন দেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ভারতের শাস্ত্র ধর্ম ও সংস্কৃতির জন্য এক পরমতম আশীর্বাদ। □

শোক সংবাদ

দিল্লি নিবাসী প্রবীণ স্বয়ংসেবক নরেশ চতুর্বেদী গত ২০ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ে তাঁর পৈতৃক নিবাস। কর্মসূত্রে তিনি হুগলী জেলার রিষড়ায় প্রায় ৪৩ বছর বসবাস করেছেন। সেই সূত্রে জেলার সঙ্ঘকাজের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। শেষে তিনি জেলা ব্যবস্থা প্রমুখের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর সময়েই হুগলী জেলা আর্থিক দিক থেকে আত্মনির্ভর হয় এবং জেলার নিজস্ব প্রথম কার্যালয় 'জ্যোতির্ময়' (স্বর্গীয় বিভাগ সঙ্ঘচালক ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্যের নামানুসারে) নির্মিত হয়। স্বল্পবাক, বাংলাভাষায় সাবলীল এই মানুষটি শুধু স্বয়ংসেবকদেরই নয়, স্থানীয় মানুষজনেরও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী, ৩ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

উত্তর মালদার মালতীপুর খণ্ডের অনুপনগর শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক শিবপদ মণ্ডল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভ থেকে পুণ্যস্নান সেরে বাড়ি ফেরার পথে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ১কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।